POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّہُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡ ۪ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَہُمۡ دِیۡنَہُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَہُمۡ وَ لَیُبَدِّلَنَّہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِہِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا ؕ وَ مَنۡ کَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

(সূরা নূর: ৫৬)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 19-20

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7-14 মে- 2026 19-26 যুল কাআদা 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত

عَنۡ حُذَیۡفَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ تَکُوۡنُ النُّبُوَّۃُ فِیۡکُمۡ مَاشَآءَ اللّٰہُ اَنۡ تَکُوۡنَ ثُمَّ یَرۡفَعُہَا اللّٰہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوۡنُ خِلَافَۃٌ عَلٰی مِنۡہَاجِ النُّبُوَّۃِ مَاشَآءَ اللّٰہُ اَنۡ تَکُوۡنَ ثُمَّ یَرۡفَعُہَا اللّٰہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوۡنُ مُلۡکًا عَاضًّا فَتَکُوۡنُ مَاشَآءَ اللّٰہُ اَنۡ تَکُوۡنَ ثُمَّ یَرۡفَعُہَا اللّٰہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوۡنُ مُلۡکًا جَبۡرِیَّۃً فَیَکُوۡنُ مَاشَآءَ اللّٰہُ اَنۡ تَکُوۡنَ ثُمَّ یَرۡفَعُہَا اللّٰہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوۡنُ خِلَافَۃٌ عَلٰی مِنۡہَاجِ النُّبُوَّۃِ ثُمَّ سَکَتَ۔

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করবেন। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়তের আদর্শের উপর খেলাফত (খিলাফত 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করবেন। তারপর আল্লাহ তাআলা এ নিয়ামতও উঠিয়ে নেবেন। এরপর অত্যাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করবেন। যখন সেই যুগ শেষ হবে, তখন তার চেয়েও অধিক জালিম ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা-ও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করবেন। তারপর আল্লাহ তাআলা জুলুম ও নির্যাতনের সেই যুগের অবসান ঘটাবেন, যার পর পুনরায় নবুওয়তের আদর্শের উপর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এ কথা বলার পর মহানবী (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।

(মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৩; মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইনযার ওয়াত তাহযীর)

আরও বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন:

اِنۡ رَاَیۡتَ یَوۡمَئِذٍ خَلِیۡفَۃَ اللّٰہِ فِی الۡاَرۡضِ فَالۡزَمۡہُ وَاِنۡ نُہِکَ جِسۡمُکَ وَاُخِذَ مَالُکَ۔

"যদি তুমি সেই সময় পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফাকে দেখতে পাও, তবে দৃঢ়ভাবে তাকে আঁকড়ে ধরবে, যদিও তোমার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়।"

(মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস-২২৯১৬)

তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"খলীফা অর্থ উত্তরসূরি। আর কোনো রাসূলের প্রকৃত উত্তরসূরি অর্থ ও বাস্তবতার দিক থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই হতে পারে, যে ছায়াস্বরূপ ও অনুসারীরূপে নিজের মধ্যে সেই রাসূলের কামালাত ও গুণাবলি ধারণ করে। এ কারণেই রাসূলে করীম অত্যাচারী বাদশাহদের উপর 'খলীফা' শব্দের প্রয়োগ পছন্দ করেননি। কেননা খলীফা প্রকৃতপক্ষে একজন রাসূলেরই ছায়া (যিল্ল) হয়ে থাকে। আর যেহেতু কোনো মানুষের জন্য চিরস্থায়ীভাবে পৃথিবীতে টিকে থাকা সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন যে, রাসূলের অস্তিত্ব–যা সমস্ত জগতের অস্তিত্বের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন–তা যেন ছায়াস্বরূপে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা খেলাফতের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যাতে পৃথিবী কখনো এবং কোনো যুগেই নবুওয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৫৩)

তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেছেন: অর্থাৎ- 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন।

(আল ওসীয়ত, পৃ: ৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আহমদীয়া খিলাফত
জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার সেতুবন্ধন

রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা আল-জুমুআহ-এর এই আয়াত- 'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম"'এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যদের জন্যও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি '-এর তাফসির করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, উম্মতের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এবং ঈমানের সুরাইয়া (প্লেইয়াডিস) নক্ষত্রমণ্ডলে উঠে যাওয়ার পর, তা আবার ফারস (পারস্য)-এর লোকদের মাধ্যমে পুনরায় একত্রিত হবে। তিনি আরও এক স্থানে বলেন যে, নবুয়তের পর খিলাফত উম্মতের মধ্যে চলতে থাকবে, তারপর রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হবে, যা বিভেদ), বিভাজন, এবং রক্তপাত ও সহিংসতা দ্বারা চিহ্নিত হবে। শেষ পর্যন্ত পুনরায় নবুয়তের আদর্শের উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। (মিশকাত, বাব ইনজার ওয়াত তাহজির)

সূরা আল-জুমুআহ-এর এই কুরআনিক আয়াত এবং উল্লিখিত হাদিস অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, এমন এক সময় আসবে যখন ঈমান পৃথিবী থেকে উঠে সুরাইয়া নক্ষত্রে পোঁছে যাবে, এবং সেই সময় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে। মুসলমানদের উপর চারদিক থেকে আক্রমণ হবে। পারস্পরিক বিরোধ তাদের দুর্বল করে দেবে, এবং সব জাতি ইসলামকে দমন করার চেষ্টা করবে।

এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ? মুক্তির উপায় হিসেবে তরবারির নির্দেশ দেননি; বরং তিনি বলেছেন যে, ইমাম মাহদি ও প্রতিশ্রুত মসীহ আগমন করবেন, এবং তারা তীর-তলোয়ার ছাড়াই ইসলামের শক্তিশালী আধ্যাত্মিক যুক্তির মাধ্যমে ইসলামকে সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করবেন। প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের সুসংবাদ দিতে গিয়ে তিনি বলেন: 'ইউজাউল হারব' অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ এসে যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মসীহ ও মাহদি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন:

"ইসলামের বিজয় নির্ভর করে চূড়ান্ত যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণের উপর, এবং এটি এই নগণ্য ব্যক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত-হোক তা আমার জীবদ্দশায় বা আমার মৃত্যুর পর।" (বরাহিনে আহমদিয়া, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯, টীকা; তাফসিরে মসীহ মওউদ, খণ্ড ৩)

এই বিজয়ের জন্য তিনি তাঁর ১৯০৫ সালে রচিত গ্রন্থ আল-ওসিয়্যাত-এ উল্লেখ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে আহমদিয়া একটি মহান মাধ্যম হবে। তিনি বলেন:

"তোমাদের জন্য দ্বিতীয় শক্তির প্রকাশ দেখা প্রয়োজন, এবং তার আগমন তোমাদের জন্য উত্তম, কারণ তা স্থায়ী এবং যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় শক্তি আমার প্রস্থান ছাড়া আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, তখন আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় শক্তি পাঠাবেন, যা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবে এই প্রতিশ্রুতি আমার ব্যক্তিগত সত্তা সম্পর্কে নয়, বরং তোমাদের সম্পর্কে। যেমন আল্লাহ বলেন যে, আমি এই জামাত-কে, যারা তোমার অনুসারী, কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর প্রাধান্য দান করব। সুতরাং প্রয়োজন যে, আমার বিচ্ছেদের দিন আসুক, তারপর আসবে সেই দিন, যা স্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক শক্তির রূপে আবির্ভূত হয়েছি, এবং আমার পরে আরও ব্যক্তিরা আসবেন, যারা দ্বিতীয় শক্তির প্রকাশ হবেন।"

(আল-ওসিয়্যাত, পৃ. ৮)

তিনি আরও বলেন: "তিনি এই আন্দোলনকে পূর্ণ উন্নতি দান করবেন-কিছুটা আমার হাতে এবং কিছুটা আমার পর। আদিকাল থেকে এটি আল্লাহর নিয়ম যে, তিনি তাঁর নবী ও রাসূলদের সাহায্য করেন এবং তাদের বিজয় দান করেন্ কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতেই শেষ করেন না। বরং এমন এক সময়ে তাদের ইন্তেকাল ঘটান, যখন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকে, যাতে বিরোধীরা উপহাস ও বিদ্রুপের সুযোগ পায়; এবং যখন তারা তাদের উপহাস শেষ করে, তখন তিনি তাঁর ক্ষমতার আরেকটি দিক প্রদর্শন করেন।" (আল-ওসিয়্যাত)

তিনি এই বিজয়ের জন্য একটি সময়সীমাও নির্ধারণ করেন:

"আজ থেকে তিন শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার আগেই, যারা ঈসার প্রত্যাশা করে-মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান-তারা সম্পূর্ণ নিরাশ ও বিমুখ হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাস ত্যাগ করবে। এবং পৃথিবীতে একটিই ধর্ম ও একটিই নেতা থাকবে। আমি তো শুধু একটি বীজ বপন করতে এসেছি; সেই বীজ আমার হাতে বপিত হয়েছে, এখন তা ফুলে ও ফলে সুশোভিত হবে, এবং কেউই তা থামাতে পারবে না।"

(তাযকিরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২০, পৃ. ৬৭)

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ, হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম)-এর ইন্তেকালের পর ২৭ মে ১৯০৮ সালে জামাতে আহমদিয়ায় খিলাফতে আহমদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতিশ্রুত মসীহের প্রথম খলিফা, খলিফাতুল মসীহ প্রথম হিসেবে মনোনীত হন এবং তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর মাধ্যমে জামাত আবারও জাতীয় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং খিলাফত-যা ঐক্য ও জামাতের ভবিষ্যৎ উন্নতির গ্যারান্টি ছিল-খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ এবং ইসলামের স্থিতিশীলতার জন্য আপন-পর সবার সামনে সীসা-গলিত প্রাচীরের মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল(রাযিয়াল্লাহু আনহু) ভালোভাবেই জানতেন যে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও তার সশক্তিকরণই প্রকৃতপক্ষে জামাতে আহমদিয়ার প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তার নিশ্চয়তা, বরং ইসলামের শক্তি ও তার বিজয়েরও গ্যারান্টি। এর মাধ্যমে জামাতের সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং ইসলামের প্রচার কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে আজ, খিলাফতের প্রতিষ্ঠার ১১৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, জামাতের সদস্যরা এবং অন্যরাও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে যে এই দ্রুত উন্নতি এবং অল্প সময়ে এই বিস্ময়কর বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতেরই ফল। যারা খিলাফতের প্রতিষ্ঠার সময় এটিকে অস্বীকার করেছিল এবং এর বিরোধিতা করেছিল-তারা প্রতিশ্রুত মসীহের ঘোষিত ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা তো দূরের কথা, আজ নিজেদের সামষ্টিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও হিমশিম খাচ্ছে।

অন্যদিকে, খিলাফতের ছায়াতলে জামাতে আহমদিয়া বর্তমানে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে বিস্তৃত হয়েছে। জামাতের মুবাল্লিগগণ-যাদের বীজ প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে বপন করা হয়েছিল-খিলাফতের যুগগুলোতে বিস্তৃত হয়ে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিষ্টি ও জীবনদায়ী ঝরনা পিপাসার্ত আত্মাগুলোর কাছে পোঁছে দিচ্ছে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যার সূচনা হয়েছিল হযরত খলিফাতুল মসীহ প্রথম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাধ্যমে কাদিয়ানের মসজিদ আকসা থেকে, আজ এমটিএ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ সর্বত্র কুরআনের অনুবাদ থেকে উপকৃত হচ্ছে। কুরআন শরীফের অনুবাদ এখন ৭০টিরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্বের মানুষ সেগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে।

মাদ্রাসা আহমদিয়া, যা প্রতিশ্রুত মসীহ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এখন খিলাফতের যুগে 'জামিয়া আহমদিয়া' নামে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে এবং এর শাখাগুলো পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মুবাল্লিগ দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইসলামের জীবনদায়ী শিক্ষা বিশ্বব্যাপী প্রচার করছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থসমূহ রূহানি খাজায়েন, আহমদিয়া খিলাফতের খলিফাগণের জ্ঞানভান্ডার এবং অন্যান্য জামাতি সাহিত্য প্রকাশের কার্যক্রম খিলাফতের বরকতময় যুগে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই গ্রন্থসমূহ

এরপর ১৪ পাতায়...

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

জুমআর খুতবা

› "আমরা মহা অকৃতজ্ঞ হব যদি এ কথা স্বীকার না করি যে, প্রকৃত তাওহীদ আমরা এই নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি এবং জীবন্ত খোদার পরিচয়ও আমরা এই পূর্ণাঙ্গ নবী ও তাঁর নূরের মাধ্যমেই পেয়েছি। আর খোদার সঙ্গে কথোপকথনের যে সম্মান, যার মাধ্যমে আমরা তাঁর চেহারা অবলোকন করি, তাও আমরা এই মহান নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। এই হেদায়াতের সূর্যের কিরণ রৌদ্রের ন্যায় আমাদের উপর পতিত হয় এবং আমরা ততক্ষণই আলোকিত থাকতে পারি যতক্ষণ আমরা এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকি।"

(হযরত মসীহ মওউদ)

তাওহীদ ছিল সেই মহান উদ্দেশ্য, যার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আগমন করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে কেবল তাঁর নিজের কথা ও কাজ থেকেই যে গভীর আকুলতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তা-ই নয়, বরং তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তাওহীদের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার এমন এক আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন, যার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

তাঁর বাস্তব আদর্শ, তাঁর ব্যাকুলতা এবং তাঁর দোয়ার ফলেই সাহাবীরাও এমন উচ্চ মান অর্জন করেছিলেন যে, তাঁরা প্রতিটি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

হাজারো হাজার দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র সত্তার উপর-তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অন্তরে যে জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা কখনো এক মুহূর্তের জন্যও কমে যায়নি। তিনি সমস্ত কষ্ট ও নির্যাতনকে যেন অন্তরের প্রফুল্লতা ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলেন, অথচ মানবজাতির প্রতি তাঁর দয়া, মমতা ও ভালোবাসার মধ্যে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায়নি।

এক আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে বছরের পর বছর এমন সব কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে, যার কোনো সীমা নেই। (হযরত মুসলেহ মওউদ)

তাওহীদের ঘোষণা করার "অপরাধে"মক্কার কাফিররা তিন বছর পর্যন্ত তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে শি'বে আবি তালিবে এমনভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল যে, তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সামাজিক বয়কট আরোপ করা হয়েছিল। আর যখন সেই বয়কট শেষ হলো, তখন একদিকে নবী আকরাম পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের সঙ্গে সমগ্র মক্কায় পুনরায় তাওহীদের প্রচার শুরু করলেন; অন্যদিকে কুরাইশরা আবারও তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করল।

তাঁর অসহায় অবস্থার সূচনা এবং তাঁর মহিমান্বিত পরিণতি নিজেই আল্লাহ তাআলার তাওহীদের এক মহান প্রমাণ ছিল। (হযরত মুসলেহ মওউদ)

তিনি মক্কায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতেন। এ ছাড়াও তিনি আরবের বিভিন্ন বাজারে গিয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন।

আপন ও পর-উভয় দিক থেকেই তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কারণে তাঁকে কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি তিনি প্রকাশ্যে ইবাদতও করতে পারতেন না।

একদিকে কুরাইশরা নিজেদের শক্তি ও নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে কূটনৈতিক ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে কোনো না কোনোভাবে ইসলামের প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে; অন্যদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের উপর এমন জুলুম, বর্বরতা ও নিষ্ঠুর আচরণ চালিয়েছিল যে, তার বিস্তারিত বর্ণনা করার শক্তি কলমের নেই এবং তা বর্ণনা করার সাহসও কারো নেই।

অসংখ্য দাস, স্বাধীন পুরুষ ও নারী ছিলেন, যারা তাওহীদের উপর ঈমান আনার কারণে মক্কার কাফিরদের লজ্জাজনক ও হৃদয়বিদারক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। কাফিররা যেমন দুর্বল মুসলমানদের উপর জুলুম করত, তেমনি তাঁর পবিত্র সত্তাও তাদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না। যদি দেখা যায়, তবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট, দুঃখ ও নির্যাতনের সম্মুখীন তাকেই হতে হয়েছে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ মার্চ, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৩ আমান ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

দুই জুমা আগে মহানবী মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি তাঁর জীবনের একটি দিকের কথা উল্লেখ করেছিলাম- "তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠার জন্য গভীর আকুলতা।"

এটাই ছিল সেই মহান উদ্দেশ্য, যার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যের জন্য শুধু তাঁর নিজের কথা ও কাজেই গভীর ব্যাকুলতা ও আবেগের প্রকাশ পাওয়া যায়নি, বরং তিনি তাঁর সাহাবীগণ ও অনুসারীদের মধ্যেও তাওহীদের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার এমন এক আত্মা সঞ্চার করেছিলেন, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাই হোক, আজও আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনের এই একই দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং এ প্রসঙ্গে সাহাবীগণের কিছু ত্যাগের ঘটনাও উল্লেখ হবে।

মহানবী (সা.)-এর বাস্তব আদর্শ, তাঁর আকুলতা ও দোয়ারই ফল ছিল যে সাহাবীগণ এমন উচ্চমান অর্জন করেছিলেন, যার ফলে তারা প্রতিটি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী ? যে কষ্ট সহ্য করেছেন, সে সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ রয়েছে:একবার মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল ?-কে বলল, "তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলো না?"মহানবী ? বললেন, "হ্যাঁ।"এ কথা শুনে তারা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে গেল। তখন কেউ হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলল, "তোমার বন্ধুর খবর নাও।"হযরত আবু

বকর (রা.) বের হয়ে মসজিদে হারামে পৌঁছালেন। তিনি দেখলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, "তোমাদের সর্বনাশ হোক!এরপর, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এসেছে, তিনি বললেন:" তোমরা কি শুধু এ কারণে একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও যে সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ,' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে? (সূরা আল-মু'মিন: ২৯) এ কথা শুনে তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে মারতে লাগল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) বলেন, তিনি এমন অবস্থায় ঘরে ফিরেছিলেন যে তিনি যখন নিজের চুলে হাত দিতেন, তখন চুল তাঁর হাতে উঠে আসত। তারা এত জোরে তাঁর চুল টেনেছিল যে চুল গোড়া থেকে উপড়ে গিয়েছিল। তবুও হযরত আবু বকর (রা.) বলতে থাকলেন:"তাবারাকতা ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম " হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকতময়। " আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, তারা মহানবী (স.)-এর মুবারক মাথার চুল ও দাড়ি এত জোরে টেনেছিল যে তাঁর অনেক চুল পড়ে গিয়েছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়ালেন এবং বলতে থাকলেন: " তোমরা কি শুধু এ কারণে একজন মানুষকে হত্যা করবে যে সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'? এবং হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন:" হে আবু বকর! তাদের ছেড়ে দাও। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এ জন্যই প্রেরিত হয়েছি যাতে আমি কুরবান হয়ে যাই। "এরপর তারা আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে ছেড়ে দেয়।

(আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৭, বাব ইস্তিখফাইহি ওয়া আসহাবিহি ফি দারিল আরকাম ইবনে আবিল আরকাম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০২)

অর্থাৎ, যখন তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যাচার করছিল এবং তাঁকে মারছিল, আর হযরত আবু বকর (রা.) মাঝখানে এসে পড়েছিলেন, তখন মহানবী (সা.)-ই বলেছিলেন, "তাদের ছেড়ে দাও।"

অনুরূপভাবেই আরেক বর্ণনাকারী হারিস বিন হারিস গামিদী কুরাইশদের মহানবী ?-এর ওপর অত্যাচার করতে দেখে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, "এরা কারা? এটি কোনো একক ঘটনা ছিল না। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটতেই থাকত। এগুলো একই ধরনের ঘটনা, যা বহু মানুষ দেখেছে এবং বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন বর্ণনাকারী রয়েছেন- কেউ বিস্তারিত বলেছেন, কেউ সংক্ষেপে বলেছেন।যাই হোক, যখন তিনি দেখলেন এবং তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন যে এরা কার ওপর অত্যাচার করছে, তখন তাঁর পিতা বললেন, "এরা তাদের ধর্মত্যাগীকে ঘিরে আছে।"মক্কার লোকেরা বিদ্রুপ করে মহানবী ? ও মুসলমানদের " সাবি "বলে ডাকত।বর্ণনাকারী বলেন, "আমরাও আমাদের সওয়ারি থেকে নেমে পড়লাম এবং দেখলাম যে আল্লাহর রাসূল (সা.) মানুষকে আল্লাহ তাআলার তাওহীদের দিকে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছেন, আর তারা তাঁকে অস্বীকার করছে ও কষ্ট দিচ্ছে। এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং অবশেষে লোকেরা তাঁর চারপাশ থেকে সরে গেল।"

(আল-মু'জামুল কাবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৪, "আল-হারিস বিন আল-হারিস আল-গামিদী, হাদীস ৩৩৭৩, মাকতাবাহ ইবনে তাইমিয়্যাহ, কায়রো)

মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যাচারের উল্লেখ বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখান থেকে গ্রহণ করে মুসলেহ মওউদ (রা.) তাফসীরুল কুরআনের ভূমিকায়ও লিখেছেন:

"একবার মহানবী (সা.) বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মক্কার একদল বখাটে তাঁকে ঘিরে ফেলল এবং পুরো রাস্তা জুড়ে তাঁর ঘাড়ে থাপ্পড় মারতে মারতে বলতে লাগল, 'লোকেরা! এ সেই ব্যক্তি যে দাবি করে সে নবী।' চারপাশের ঘরগুলো থেকে তাঁর ঘরে অবিরত পাথর নিক্ষেপ করা হতো।" তাঁর ঘরে নোংরা জিনিস ফেলা হতো। "রান্নাঘরে নোংরা জিনিস নিক্ষেপ করা হতো, যার মধ্যে ছাগল ও উটের নাড়িভুঁড়িও ছিল। যখন তিনি ? নামাজ পড়তেন, তখন তাঁর ওপর ধুলো-ময়লা নিক্ষেপ করা হতো।" মাটি ছুঁড়ে মারা হতো তাঁর ওপর। "এমনকি বাধ্য হয়ে তাঁকে একটি পাথরের নিচে, যা পাহাড় থেকে বেরিয়ে ছিল, লুকিয়ে নামাজ পড়তে হতো।"

(দীবাচা তাফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৯৮)

কিন্তু মহানবী মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক- তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অন্তরে যে আকুলতা উথলে উঠছিল, তা এক মুহূর্তের জন্যও কমে যায়নি। তিনি এসব কষ্ট যেন হৃদয়ের আনন্দ ও পরম সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তারপরও মানবজাতির প্রতি তাঁর দয়া ও ভালোবাসায় বিন্দুমাত্রও ঘাটতি আসেনি।

হযরত মুসলে মওউদ (রা.) আরও লিখেছেন: "যখন আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলি দেখি, তখন এই দাবি আমাদের কাছে এক বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এমন সব ঘটনা দেখতে পাই, যা মানবজাতির প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা ও মমতার প্রমাণ বহন করে। এক আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে বছরের পর বছর এমন সব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, যার কোনো সীমা ছিল না।

একবার কাবা ঘরে কাফিররা তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে এত জোরে টেনেছিল যে তাঁর চোখ লাল হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) খবর শুনে দৌড়ে এলেন এবং মহানবী (সা.)-কে সে অবস্থায় দেখে তাঁর চোখে অশ্রু এসে গেল। তিনি কাফিরদের সরিয়ে দিয়ে বললেন: 'আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা কি শুধু এ কারণে একজন মানুষের ওপর অত্যাচার করছ যে সে বলে- আল্লাহ আমার প্রতিপালক?' (তাফসীর কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩১৬, সংস্করণ ২০২৩)

একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে বললেনঃ " তোমরা বলো: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' - আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তোমরা এ কথা বলো, তবে সফলতা লাভ করবে।" এই কথা শুনে কুরাইশরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে এলো, অর্থাৎ তিনি (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করার জন্য। তখন হারিস ইবনে আবি হালাহ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালেন। তিনি ঐ লোকদের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ? থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। অতঃপর সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এমনকি তাঁকে শহীদ করে দিল।

(আমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা ২৯৭, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৯)

তাওহীদের ঘোষণা করার অপরাধে মক্কার কাফিররা তিন বছর পর্যন্ত মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবারকে শি'বে আবি তালিবে এমনভাবে অবরুদ্ধ করে রাখল যে তাদের ওপর পূর্ণ সামাজিক বয়কট আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন এই বয়কটের অবসান হলো, তখন একদিকে মহানবী ? আগের চেয়ে আরও অধিক দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে সমগ্র মক্কায় তাওহীদের প্রচার পুনরায় শুরু করলেন, আর অন্যদিকে কুরাইশরা আবারও তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করল। নবী করীম (সা.)এর তায়েফ সফরের বিখ্যাত ঘটনাও রয়েছে, যা বহুবার পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁর ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল, ইতিহাসে তা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মির্যা বশীর আহমদ এম.এ-ও এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন। এক স্থানে তিনি ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"যখন অবরোধ উঠে গেল এবং মহানবী (সা,) তাঁর চলাফেরায় কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন।" এ ঘটনা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এখানে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। "তায়েফ ছিল মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং সে সময় সেখানে বানু সাকীফ গোত্র বসবাস করত। কাবার বিশেষ মর্যাদা বাদ দিলে তায়েফ যেন মক্কার সমকক্ষ ছিল। সেখানে বহু প্রভাবশালী ও ধনবান ব্যক্তি বাস করত এবং তায়েফের এই গুরুত্ব মক্কার লোকেরাও স্বীকার করত। যেমন কুরআন শরীফে মক্কার লোকদের এই উক্তি এসেছে لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে তা মক্কা বা তায়েফের কোনো বড় ব্যক্তির ওপর কেন অবতীর্ণ করা হলো না?

"সংক্ষেপে, নবুয়তের দশম বছরের শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তায়েফে গেলেন একাকী, অথবা কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী যায়েদ বিন হারিস তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দশ দিন অবস্থান করলেন এবং শহরের বহু নেতার সঙ্গে একের পর এক সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু মক্কার মতো তখনও তায়েফের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ লেখা ছিল না। ফলে সবাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, বরং উপহাসও করল।

"অবশেষে মহানবী (সা.) তায়েফের প্রধান নেতা আবদে ইয়ালিলের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সেও স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল এবং উপহাসের ভঙ্গিতে বললঃ 'আপনি যদি সত্যবাদী হন, তবে আপনার সঙ্গে কথা বলার সাহস আমার নেই, আর যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আপনার সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন।'

"এই ছিল তার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে দেওয়া উত্তর। তারপর এ আশঙ্কায় যে, শহরের যুবকদের ওপর হয়তো তাঁর কথার প্রভাব পড়ে যেতে পারে, সে বললঃ 'আপনার জন্য ভালো হবে এখান থেকে চলে যাওয়া, কারণ এখানে কেউ আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত নয়।'

"এরপর সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি শহরের উচ্ছৃঙ্খল লোকদের মহানবী (সা.)-এর পেছনে লাগিয়ে দিল। যখন মহানবী (সা.) শহর থেকে বের হলেন, তখন তারা

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

চিৎকার করতে করতে তাঁর পেছনে চলল এবং তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল, এমনকি তাঁর সমগ্র শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। টানা তিন মাইল পর্যন্ত তারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল, গালাগালি করতে লাগল এবং পাথর নিক্ষেপ করতে থাকল।

"তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার নেতা উতবা ইবনে রাবী'আর একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) সেখানে আশ্রয় নিলেন এবং অবশেষে জালিম লোকেরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেল। সেখানে এক ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ۔ اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ۔

অর্থাৎঃ "হে আমার রব! আমি আমার শক্তিহীনতা, অক্ষমতা এবং মানুষের সামনে আমার অসহায়ত্বের অভিযোগ কেবল তোমার কাছেই করছি। হে আমার আল্লাহ! তুমি সকল দয়াশীলের চেয়ে অধিক দয়ালু। তুমিই দুর্বল ও অসহায়দের অভিভাবক ও রক্ষক এবং তুমিই আমার প্রতিপালক...

"এরপর দোয়ায় তিনি আরও বলেছিলেনঃ 'আমি তোমার চেহারার নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কারণ তুমিই অন্ধকার দূর কর এবং মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের উত্তরাধিকারী বানাও।'

"সে সময় উতবা ও শাইবা ঐ বাগানে উপস্থিত ছিল। তারা যখন মহানবী ?-কে এই অবস্থায় দেখল, তখন দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা, জাতীয় অনুভূতি অথবা অন্য কোনো কারণে তাদের খ্রিষ্টান গোলাম আদ্দাসের হাতে এক থালা আঙ্গুর পাঠিয়ে দিল। "মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করলেন এবং আদ্দাসকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তুমি কোথাকার বাসিন্দা এবং কোন ধর্মের অনুসারী?'

"সে বললঃ 'আমি নেনেভার বাসিন্দা এবং ধর্মে খ্রিষ্টান।'

"মহানবী (সা.) বললেনঃ 'এ কি সেই নেনেভা, যা আল্লাহর সৎ বান্দা ইউনুস ইবনে মত্তার আবাসস্থল ছিল?'

"আদ্দাস বললঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ইউনুস সম্পর্কে কীভাবে জানলেন?'

"মহানবী (সা.) বললেনঃ 'তিনি আমার ভাই ছিলেন, কারণ তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন এবং আমিও আল্লাহর নবী।'

"এরপর মহানবী (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, যা তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলল। সে আন্তরিক আবেগে সামনে এগিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর হাত চুম্বন করল।

"উতবা ও শাইবা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। অতঃপর আদ্দাস যখন তাদের কাছে ফিরে গেল, তখন তারা বললঃ 'আদ্দাস! তোমার কী হয়েছিল যে তুমি ঐ ব্যক্তির হাত চুম্বন করতে শুরু করলে? সে তোমার ধর্ম নষ্ট করে দেবে, অথচ তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।'

"মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ ঐ বাগানে বিশ্রাম নিলেন, তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে নাখলায় পৌঁছালেন, যা মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এরপর নাখলা থেকে রওনা হয়ে হিরার দিকে এলেন। যেহেতু আশঙ্কা ছিল যে তায়েফ সফরের আপাত ব্যর্থতার কারণে মক্কার লোকেরা আরও সাহসী হয়ে উঠবে এবং নির্যাতন বাড়িয়ে দেবে, তাই তিনি সেখান থেকে একজনের মাধ্যমে মুতইম ইবনে আদীকে বার্তা পাঠালেনঃ 'আমি মক্কায় প্রবেশ করতে চাই। তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারো?'

"মুতইম ছিল কঠোর কাফির, কিন্তু তার স্বভাবে ছিল ভদ্রতা ও সম্মানবোধ। আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাউকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করা আরবের সম্মানিত লোকদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই সে তার পুত্র ও আত্মীয়দের সঙ্গে নিল এবং সবাই অস্ত্রধারী হয়ে কাবার কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মহানবী ?-কে খবর পাঠাল যে তিনি আসতে পারেন।

মহানবী (সা.) এলেন, কাবা তাওয়াফ করলেন এবং তারপর মুতইম ও তার সন্তানদের তরবারির ছায়ায় নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন। পথে আবু জাহল মুতইমকে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়ে বললঃ

'তুমি কি শুধু মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছ, নাকি তার অনুসারী হয়ে গেছ?'

মুতইম বললঃ 'আমি কেবল আশ্রয়দাতা, অনুসারী নই।' তখন আবু জাহল বললঃ 'আচ্ছা, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।' মুতইম কুফরের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছিল... তবুও এটি ছিল তার একটি সৎকর্ম।

এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে একবার অরংযধ মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও কি কখনো তাঁর ওপর অধিক কষ্টের দিন এসেছে? মহানবী (সা.) উত্তরে বললেনঃ "আয়েশা! তোমার জাতির পক্ষ থেকে আমি বহু কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয়েছি।"

এরপর তিনি তায়েফ সফরের ঘটনাবলি বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে, সেই সফর থেকে ফেরার পথে পাহাড়ের ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলেছিলঃ

"আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি আদেশ করলে আমি এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে এদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিই।"

মহানবী (সা.) বললেনঃ "না, না! আমি আশা করি আল্লাহ এদের মধ্য থেকেই এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৬, নতুন সংস্করণ)

মানুষের প্রতি সহানুভূতি মহানবী (সা.)-এর অন্তরে প্রবল হয়ে উঠেছিল, আর এর পাশাপাশি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে একদিন তাদের বংশধরেরা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

তাওহীদের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে অসীম কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন- "শত্রুদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে যত কষ্ট দেওয়া হয়েছে, সবই ছিল তাওহীদের প্রচারের কারণে। তাঁকে প্রহার করা হতো, তাঁর পেছনে কুকুর ও দুষ্ট ছেলেদের লাগিয়ে দেওয়া হতো। একবার তিনি (সা.) তায়েফে গেলে সেখানকার লোকেরা তাঁকে এত মারধর করেছিল যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।"

এই বিস্তারিত ঘটনা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

"মহানবী (সা.) যন্ত্রণায় ও ক্লান্তিতে পড়ে যেতেন, কিন্তু যখনই তিনি আবার উঠতেন, তখনই লোকেরা পুনরায় তাঁর দিকে পাথর নিক্ষেপ করত। এমন অবস্থাতেও তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এই কথাই বের হতো- 'হে আল্লাহ! এদের ক্ষমা করে দাও, কারণ এরা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ।'

এতসব পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও মহানবী (সা.) তাওহীদের প্রচার কখনো ত্যাগ করেননি। তিনি অবিরত বলতে থাকতেন, মানুষ তাঁর সঙ্গে যা-ই করুক না কেন, তিনি আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার কখনো বন্ধ করতে পারেন না।

অতঃপর যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখনও তিনি তাওহীদের কথাই বলতে বলতে ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ, সারা জীবনই তাঁর কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর একত্ববাদ। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন- "আমার পরে শিরক করো না।"

তিনি আরও লিখেছেন- "বরং আমি তো মনে করি, মহানবী (সা.)-এর জন্মের সময়ও আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের তাওহীদের প্রমাণ এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, নবী (সা.)-এর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই এবং মাতা জন্মের কিছুদিন পরেই ইন্তেকাল করেন।"

অর্থাৎ, তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর মধ্যেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক গভীর হিকমত ছিল- যাতে আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তবতা প্রকাশ পায়। "তাঁর অসহায় জীবনের সূচনা- যখন তাঁর না ছিল পিতা, না ছিল মাতা- "এবং তাঁর মহিমান্বিত পরিণতি নিজেই আল্লাহ তাআলার তাওহীদের এক মহান প্রমাণ ছিল।"

(সীরাতুননবী, পৃ. ১৮৮)

এই বিষয় থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যাঁর তাওহীদের প্রচার মহানবী ? (সা.)সারা জীবন করেছেন, সেই আল্লাহই শৈশব থেকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেছেন।

আরবের বাজারগুলোতেও মহানবী (সা.)-এর প্রচারের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) মক্কায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াতের কাজ করতেন। এর পাশাপাশি তিনি আরবের বিভিন্ন বাজারেও যেতেন এবং সেখানে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন, যাঁর কোনো শরিক নেই।

মক্কার বাইরে বিভিন্ন স্থানে লোকেরা সমবেত হতো, যেখানে কেনাবেচাও হতো এবং মানুষের বিশাল সমাগমও ঘটত। এসব স্থানকে বলা হতো আসওয়াকুল আরব- অর্থাৎ আরবের বাজার। উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে যাকে মেলা বলা হয়, সেরকমই ছিল এই সমাবেশগুলো।

উকায, মাজান্নাহ এবং যুল-মাজায ছিল কুরাইশ ও আরবদের বিখ্যাত বাজার। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল উকাযের বাজার, যা মক্কা থেকে তিন রাতের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। আরবরা পুরো শাওয়াল মাস সেখানে অবস্থান করত। এরপর তারা মাজান্নাহ বাজারে চলে যেত, যা মক্কার নিকটে মাররুয্-যাহরানে অবস্থিত ছিল, এবং সেখানে তারা ২০ যিলকদ পর্যন্ত থাকত। তারপর তারা যুল-মাজায বাজারে যেত, যা আরাফাতের ময়দান থেকে তিন মাইল দূরে ছিল, এবং সেখানে হজ্জের দিন পর্যন্ত অবস্থান করত। এসব স্থানেই মহানবী (সা.) গিয়ে ইসলাম প্রচার করতেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। হজ্জের মৌসুমে তিনি (সা.) উকায ও মাজান্নাহর মেলায় যেতেন এবং ঘরে ঘরে, তাবুতে তাবুতে গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তিনি বলতেন-

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

"কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আছে যে আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আমার প্রতিপালকের বাণী পোঁছে দিতে পারি? আর এর বিনিময়ে তার জন্য থাকবে জান্নাত।"

(সীরাতুন নববীয়া, ইবনে কাসির, পৃ. ১৯৪, দারুল মাআরিফা, বৈরুত, ১৯৭৬)

রাবিয়া বিন ইবাদ যিনি জাহেলিয়াত যুগও দেখেছিলেন এবং পরে মুসলমান হন, তিনি বর্ণনা করেন "আমি নিজ চোখে যুল-মাজায বাজারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি। তিনি লোকদের বলছিলেন- 'হে মানুষ! তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলেই তোমরা সফল হবে।'

মহানবী (সা.) বাজারের অলিগলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু বর্ণনাকারী বলেন-

"আমি কাউকে এ কথা বলতে দেখিনি যে, রাসূল (সা.)-এর কথা মেনে নেওয়া উচিত।" তবুও মহানবী (সা.) নীরব হননি। বরং তিনি অবিরত বলে যাচ্ছিলেন-

"হে মানুষ! বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল পৃ. ৪৯৯, হাদীস ১৬১১৯, 'মুসনাদ রাবীআহ বিন ইবাদ', আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৯৯৮)

আপনজন ও পর- উভয় পক্ষ থেকেই মহানবী ? এই তাওহীদের বাণী পোঁছে দেওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হন। তিনি প্রকাশ্যে ইবাদতও করতে পারতেন না। তবুও তিনি আল্লাহর বাণী পোঁছে দিতে থাকতেন, যেন এরা ইবাদতে বাধা সৃষ্টি না করে কিংবা আক্রমণ না করে। যারা মুসলমান হতো, তাদের ওপরও চরম অত্যাচার চালানো হতো।

নামাজ ও ইবাদত সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী ? এবং অষর রনহ অনর ঞধষরন মক্কার পাহাড়ের একটি উপত্যকায় গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে নামাজ পড়তেন। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকে। পরে অনঁ ঞধষরন এ বিষয়ে জানতে পারেন এবং তাঁদের নামাজ পড়তে দেখেন।

তিনি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন- "হে আমার ভাতিজা! তুমি এ কোন ধর্ম গ্রহণ করেছ? ' মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন- "হে চাচা! এটি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রাসূলগণ এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ-এর ধর্ম। আল্লাহ আমাকে এই ধর্মসহ মানবজাতির প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। হে চাচা! আপনি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত যে আমি আপনাকে উপদেশ দিই এবং হেদায়েতের দিকে আহ্বান করি। আর আপনি-ই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এটি গ্রহণ করার এবং আমাকে সাহায্য করার।"

তখন আবু তালিব বলেন- "হে ভাতিজা! আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। তবে যতদিন আমি জীবিত থাকব, তোমার শত্রুরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।"

এরপর তিনি তাঁর পুত্র আলি ইবনে তালিব-কে জিজ্ঞেস করেন- "তুমি এ কোন ধর্ম গ্রহণ করেছ?

হযরত আলী (রা.) বলেন- "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমি তাঁর সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করি।" এ কথা শুনে আবু তালিব বলেন- "নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে কল্যাণের দিকেই আহ্বান করছেন। অতএব তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকো।"এভাবে তিনি তাঁর পুত্রকে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গেই থাকার নির্দেশ দেন।(তারিখুত তাহরী, পৃ. ৫৩৯, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৭)

আগেই যেমন বলেছি, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-ও তাওহীদগ্রহণ করার কারণে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

একদিকে মক্কার কুরাইশরা রাজনৈতিক প্রভাব, কূটনীতি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল, আর অন্যদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের ওপর এমন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা চালিয়েছিল যে, তা সম্পূর্ণরূপে লিখে প্রকাশ করার শক্তি কলমের নেই, আর বর্ণনা করার সাহসও কারো নেই।

তবুও যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই মানুষকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

যখন হযযরত বিলাল (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনলেন, তখন তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করা হতো। যখনই লোকেরা তাঁর ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে দিত, তখন তিনি বলতে থাকতেন- "আহাদ! আহাদ!" এক! এক!'

অত্যাচারকারীরা বলত, "আমরা যেভাবে বলি সেভাবে বলো!"কিন্তু হযরত বিলাল (রা.) উত্তরে বলতেন-

"তোমরা যা বলছ, আমার জিহ্বা তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।"

আরেক বর্ণনায় এসেছে, যখন মুশরিকরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কষ্ট দিত, তখন তিনি বলতে থাকতেন- "আল্লাহ! আল্লাহ!

আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, যখন হযরত বিলাল? ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর মালিকেরা তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে রাখত, তাঁর ওপর পাথর ও গরুর চামড়া চাপিয়ে দিত এবং বলত- "তোমার রব হলো লাত ও উয্যা! কিন্তু তিনি বলতে থাকতেন- "আহাদ! আহাদ!

তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে এসে বললেন- "তোমরা আর কতদিন এ মানুষটিকে কষ্ট দিতে থাকবে? অতঃপর হযরত আবু বকর? সাত উকিয়াহ মূল্যে হযরত বিলাল?-কে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। এক উকিয়াহ ছিল চল্লিশ দিরহাম। অর্থাৎ তিনি ২৮০ দিরহামে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন।

(আত্তাবাকুতল কুবরা, লি ইবনে সাআ'দ, পৃ. ১৭৫-১৭৬, "বিলাল বিন রাবাহ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯০)(উসদুল গাবাহ, পৃ. ৪১৬, "বিলাল বিন রাবাহচ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) (শারাহ যুরকানি, পৃ. ১৯৭, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

তাঁর পাশাপাশি হযরত সুমাইয়া, হযযরত আম্মার বিন ইয়াসির, হযরত খাব্বাব (রা.) এবং আরও বহু দাস, স্বাধীন পুরুষ ও নারী কেবল তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার কারণে মক্কার কাফিরদের লজ্জাজনক ও হৃদয়বিদারক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

মক্কার কাফিররা শুধু দুর্বল মুসলমানদের ওপরই অত্যাচার করেনি; বরং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্ত্বাও তাদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না- যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। বরং গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, সবচেয়ে বেশি দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে মহানবী (সা.)-কেই।

এটিও কম কষ্টের বিষয় ছিল না যে, যার নাম ছিল "মুহাম্মদ (সা.)'- অর্থাৎ "সর্বাধিক প্রশংসিতচ- তাকেই বিকৃত করে "মুযাম্মাম"বলা হতো, অর্থাৎ "সর্বাধিক নিন্দিত"(নাউযুবিল্লাহ)। যিনি সেই সমাজের সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকেই মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা হতো। যিনি ছিলেন তাঁর জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী, তাঁকেই ধোঁকাবাজ, লোভী ও প্রতারক বলা হতো। যিনি নিজের যৌবন, সুস্বাস্থ্য এবং দিন-রাত জাতির হেদায়েত, সংশোধন, কল্যাণ ও মঙ্গালের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁকেই পাগল, উন্মাদ ও অসুস্থ বলা হতো।

কখনো তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে এত জোরে টানা হতো যে, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। কখনো তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হতো, আবার কখনো তাঁর ওপর ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতো।

উরওয়া বিন জুবায়ের বর্ণনা করেন- "আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুশরিকরা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ কোনটি করেছিল?

তিনি উত্তর দেন- "একবার মহানবী (সা.) মসজিদুল হারামের হাতীমে নামাজ পড়ছিলেন। তখন উকবা ইবনে আবি মুআইত এসে তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে খুব জোরে টানতে শুরু করল।"

এমন সময় আবু বকর (রা.) এসে উকবার কাঁধ ধরে তাকে মহানবী (সা.)থেকে দূরে ঠেলে দিলেন এবং বললেন

"তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, যে শুধু বলে- 'আমার রব আল্লাহ'?

(সহীহ বুখারী, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৩২, কিতাব মানাকিবুল আনসার, হাদীস ৩৮৫৬)

তারপর আমরা এটাও দেখি-এবং বহুবার এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে-যে যুদ্ধসমূহেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা তাওহীদের জন্য অসাধারণ গায়রাত ও উদ্দীপনার প্রকাশ করেছেন।

উহুদের যুদ্ধের একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। আমরা শুনে থাকি যে, যখন আবু সুফিয়ান মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর নাম নিয়ে বলেছিল, "এরা কোথায়?"তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ? সকলকে উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ সেই সময় উত্তর দিলে মুসলমানদের দুর্বল অবস্থার কারণে তাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল। এজন্য তিনি নীরব থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এরপর আবু সুফিয়ান বলল: "হুবলের জয় হোক!

যখন সে এ কথা বলল, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাওহীদের গায়রাতে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন: "তোমরা এর উত্তর দাও!

সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: "আমরা কী বলব?" মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন: "বলো, আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এরপর আবু সুফিয়ান বলল: "আমাদের জন্য উজ্জা আছে, আর তোমাদের জন্য কোনো উজ্জা নেই।"

আবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন: "এর উত্তর দাও।"

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: "আমরা কী বলব?

তিনি (সা.) বললেন: "বলো, আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

যখনই আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাওহীদের প্রশ্ন এসেছে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোনো বিপদেরই পরোয়া করেননি।

সুতরাং, সেটিই ছিল তাওহীদের গায়রাত যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীগণ (রা.)-কে বলেছিলেন ঘোষণা করতে:

"আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।"

"তোমরা মিথ্যা বলছ। হুবলের মর্যাদা উচ্চ নয়। একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোনো শরীক নেই, তিনিই সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতু উহুদ, হাদীস ৪০৪৩)

এখন আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। এটি এমন একটি বিষয় যা বারবার পড়া ও শোনা উচিত। কারণ এটি আমাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে এবং আমাদের জন্য পথনির্দেশনা যে, কীভাবে আমরা এর সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সেই আরবী নবীর দিকে দেখি, যার নাম মুহাম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক)। তাঁর উচ্চ মর্যাদার শেষ সীমা জানা অসম্ভব এবং তাঁর পবিত্র প্রভাবের কার্যকারিতা নির্ণয় করা মানুষের কাজ নয়। আফসোস! তাঁর মর্যাদাকে যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয়নি। পৃথিবী থেকে যে তাওহীদ হারিয়ে গিয়েছিল, তিনিই সেই বীর যিনি তা পুনরায় পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা পোষণ করেছিলেন এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ গলে গিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ, যিনি তাঁর হৃদয়ের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাঁকে সমস্ত নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মনোবাঞ্ছাসমূহ পূর্ণ করেছেন।"

এটাই এ বিষয়ের সৌন্দর্য যে, তিনি একদিকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসার চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন এবং অন্যদিকে মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিরও সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিলেন-যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করে তোলে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন:

"তিনিই প্রত্যেক অনুগ্রহের উৎসস্থল। আর যে ব্যক্তি তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার না করে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কারণ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁকে দান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে লাভ করে না, সে চিরবঞ্চিত। আমরা কী বস্তু এবং আমাদের বাস্তবতাই বা কী? আমরা অকৃতজ্ঞ হব যদি এ কথা স্বীকার না করি যে, আমরা প্রকৃত তাওহীদ এই নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি এবং জীবন্ত আল্লাহর পরিচয়ও আমরা এই পূর্ণাঙ্গ নবী ও তাঁর নূরের মাধ্যমেই পেয়েছি। অনুরূপভাবে, আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও সম্বোধনের যে সম্মান-যার মাধ্যমে আমরা তাঁর চেহারা অবলোকন করি-তাও আমরা এই মহান নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। এই সূর্যসম হেদায়াতের রশ্মি সূর্যের আলোর ন্যায় আমাদের উপর পড়ে এবং আমরা কেবল ততক্ষণই আলোকিত থাকতে পারি যতক্ষণ আমরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকি।"

অতএব, আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছার জন্য এবং প্রকৃত তাওহীদকে চেনার জন্য এখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই একমাত্র মাধ্যম।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন: "যারা এই ভ্রান্ত ধারণায় অটল রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ ?-এর প্রতি ঈমান না আনে বা মুরতাদ হয়ে যায়, তবুও যদি সে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করে, তবে সে নাজাত পেয়ে যাবে এবং ঈমান না আনা বা মুরতাদ হওয়া তার কোনো ক্ষতি করবে না-এ ধরনের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের বাস্তবতা সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শুধু আল্লাহকে এক মনে করলেই নাজাত লাভ হতে পারে না। বরং নাজাত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল:

(১) প্রথমত, পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর ঈমান আনতে হবে।

(২) দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলার প্রতি এমন পরিপূর্ণ ভালোবাসা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যার প্রভাব ও আধিপত্যের ফলে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যই তার প্রাণের আরাম হয়ে দাঁড়ায়-যা ছাড়া সে বাঁচতেই না পারে।"

এমনই হওয়া উচিত সেই ভালোবাসার তীব্রতা ও প্রাধান্য।

তিনি আরও বলেন: "আর তাঁর ভালোবাসা যেন অন্য সব ভালোবাসাকে চূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এটাই প্রকৃত তাওহীদ, যা আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। কেন তা অন্যভাবে অর্জিত হতে পারে না? এর উত্তর হলো, আল্লাহর সত্তা এতই গোপন, এতই অদৃশ্য এবং এতই অন্তরালে যে মানবীয় বুদ্ধি নিজ শক্তিতে তাঁকে আবিষ্কার করতে পারে না। কোনো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণও তাঁর অস্তিত্বের উপর চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। বুদ্ধির সর্বোচ্চ ক্ষমতা হলো এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ম দেখে একজন স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা। কিন্তু কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক বিষয়, আর সেই পর্যায়ের নিশ্চিত জ্ঞানে পৌঁছানো যে, যাঁর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে তিনি বাস্তবেই বিদ্যমান-এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।"

শুধু এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, একজন স্রষ্টা থাকা উচিত। বরং যদি কেউ জানতে চায় যে তিনি সত্যিই আছেন, তিনি কে, এবং তিনি জীবন্ত আল্লাহ-তবে এই জ্ঞান কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

তিনি আরও বলেন: "আর যেহেতু কেবল যুক্তির পথ অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ ও সন্দেহপূর্ণ, তাই কোনো দার্শনিক কেবল যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না। বরং অনেকেই যারা কেবল যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহকে খুঁজে পেতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও তাদের কোনো উপকারে আসে না।"

আজ আমরা ঠিক এ দৃশ্যই দেখছি। মুসলমানদের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করছে, কারণ তারা এসব বিষয় বুঝতেই পারে না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাসমূহের উপর গভীরভাবে চিন্তা করেনি।

তিনি আরও বলেন: "আর তারা আল্লাহ তাআলার কামেল বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা ও উপহাস করে। তাদের যুক্তি হলো, পৃথিবীতে হাজারো এমন বস্তু রয়েছে যেগুলোর অস্তিত্বে তারা কোনো উপকারিতা দেখতে পায় না এবং যেগুলোর মধ্যে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক অনুসন্ধান অনুযায়ী এমন কোনো কারিগরি বা নিদর্শন তারা খুঁজে পায় না যা কোনো স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। বরং এসব বস্তুর অস্তিত্ব তাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন বলে মনে হয়।"

হায়! এ অজ্ঞ লোকেরা জানে না। তারা বলে কোনো স্রষ্টা নেই, কারণ তারা প্রতিটি বস্তুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে না। যেহেতু তাদের নিজেদের জ্ঞান নেই, তাই তারা এ ধরনের কথা বলে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন:

"হায়! এ অজ্ঞ লোকেরা জানে না যে, কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সেই বস্তুর অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ নয়।" অর্থাৎ, কেবল কেউ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে না বলেই এটি প্রমাণিত হয় না যে সেই জিনিসের অস্তিত্ব নেই।

তিনি আরও বলেন: "এই যুগে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিমান ও দার্শনিক মনে করে, অথচ তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। এখন স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, যদি তারা কোনো চূড়ান্ত ও শক্তিশালী যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেত, তবে তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করত না। আর যদি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের উপর এমন কোনো নিশ্চিত যুক্তিপ্রমাণ তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারত, তবে তারা এত নির্লজ্জভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করত না।"

সুতরাং, কোনো ব্যক্তি দার্শনিকদের নৌকায় চড়ে সন্দেহের ঝড় থেকে রক্ষা পেতে পারে না; বরং সে অবশ্যই ডুবে যাবে। আর সে কখনোই তাওহীদের বিশুদ্ধ পানীয় লাভ করতে পারবে না।

এখন চিন্তা করো, কত মিথ্যা ও দুর্গন্ধময় এই ধারণা যে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যম ছাড়া প্রকৃত তাওহীদ লাভ করা যেতে পারে এবং তাঁর অনুসরণ ব্যতীত মানুষ মুক্তি পেতে পারে।

"হে অজ্ঞ লোকেরা! যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মে, ততক্ষণ তাঁর একত্ব সম্পর্কে কিভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাতে পারে? সুতরাং দৃঢ়ভাবে জেনে রাখো যে, নিশ্চিত ও প্রকৃত তাওহীদ কেবল একজন নবীর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। যেমন আমাদের নবী হযযরত মহম্মদ (সা.) আরবের নাস্তিক ও ভ্রষ্ট লোকদের হাজারো আসমানী নিদর্শন দেখিয়ে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করেছিলেন। আর আজও যারা সত্যিকার ও পূর্ণভাবে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে, তারা নাস্তিকদের সামনে সেই নিদর্শনসমূহ পেশ করে।" আজও আমরা এসব নিদর্শন পেশ করে থাকি।

"সত্য কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবন্ত আল্লাহর জীবন্ত শক্তিসমূহ প্রত্যক্ষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তার হৃদয় থেকে বের হয় না, প্রকৃত তাওহীদও তার অন্তরে প্রবেশ করে না এবং সে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। আর এই পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ কেবল মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ করা যায়।"

(হকীকতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ১১৮-১২১)

সুতরাং, এটাই সেই প্রকৃত তাওহীদ যার অনুসন্ধান আমাদের করা উচিত এবং যার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আমাদের ঈমানকে এমন এক মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা উচিত যেখানে আমরা প্রতিটি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকি। আমাদের অন্তরে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসাও সৃষ্টি করা উচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা

মালিক সালাহুদ্দীন, মুরুব্বি সিলসিলা

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর উপর এক ব্যক্তির এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার রুপি ঋণ পরিশোধযোগ্য ছিল। সম্মানিত মিয়াঁ মুহাম্মদ আবদুর রহমান খান সাহেব ? (হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের পুত্র) এই ঋণ সম্পর্কে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের নিকট থেকে শুনেছিলেন যে-

"প্রথমবার তিনি (হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য পাঁচ রুপি কিস্তি পাঠিয়েছিলেন। ঋণদাতা এত বিপুল ঋণের তুলনায় এত সামান্য কিস্তি দেখে লিখল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন?'

তিনি উত্তরে লিখলেন, 'এই মুহূর্তে আমার কাছে এতটুকুই অর্থ ছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। ঋণ আপনার, আমার দায়িত্বে আছে, এবং আমিই তা পরিশোধ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।'

(আসহাবে আহমদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

আল্লাহ! আল্লাহ!! কী ঈমান এবং কী তাওয়াক্কুল ছিল যে বাহ্যিক অবস্থা অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তিনি এই বিশাল ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন।

মালিক সাহেবের বর্ণনা

মালিক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব কসূরী আমাকে শুনিয়েছেন, এবং তিনি নিজে এই ঘটনা সরাসরি হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর নিকট থেকে শুনেছিলেন যে, যখন হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে মহারাজা হঠাৎ চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে অবিলম্বে রাজ্য ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, কিছুদিন পরে মহারাজা উপলব্ধি করলেন যে তিনি ভালো কাজ করেননি। এরপর তিনি তাঁকে আবার ডেকে পাঠালেন এবং বললেন- "আপনি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন। আমরা আগের চেয়েও বেশি আপনার সেবা করব।"

জবাবে তিনি জানিয়ে দিলেন-

"আপনি তো কেবল একটি রাজ্যের শাসক। কিন্তু যে গৃহের আমি কর্মচারী হয়ে গেছি, তার তুলনায় পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের শাসনকেও আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

মালিক সাহেব আরও লিখেছেন- "আমি বহুবার হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুবারক মুখ থেকে শুনেছি যে, যখন আমি জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজার চাকরি থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হলাম, তখন আমার উপর এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার রুপি ঋণ ছিল। সম্ভবত এটি ১৮৯২-১৮৯৩ সালের ঘটনা।

সে সময়ে এক হিন্দু ব্যক্তি, যে আমাকে খুব ভালোবাসত, প্রায়ই আমার কাছে আসত। আমি যেহেতু আমার আয়ের বড় অংশ দান-খয়রাতের কাজে ব্যয় করতাম এবং নিজের কাছে কিছুই রাখতাম না, সে স্নেহভরে আমাকে বলত-

'হাকিম সাহেব! নিজের কাছেও কিছু অর্থ রেখে দিন। এই রাজাদের কোনো ভরসা নেই। সামান্য কারণে তারা সঙ্গে সঙ্গে চাকরি থেকে বের করে দেয়।'

আমি তাকে উত্তরে বলতাম-

'যে আল্লাহর পথে আমি অর্থ ব্যয় করি, সময় এলে তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন।'

যেদিন আমাকে হঠাৎ চাকরি থেকে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হলো, সেদিন সেই হিন্দু ব্যক্তি আমার কাছে বসা ছিল। যখন সে আমার চাকরিচ্যুত হওয়ার কথা জানল, তখন সে বলল-

'আমি কি আপনাকে বলতাম না যে এই রাজাদের কোনো ভরসা নেই? এখন আপনি সেই ব্যক্তিকে কী উত্তর দেবেন, যার কাছে আপনার এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার রুপি ঋণ আছে? আপনি আমার উপদেশের পরোয়া করতেন না। এখন বুঝবেন, আর তখন আমার উপদেশের মূল্য উপলব্ধি করবেন।'

আমি বললাম- 'যেভাবে আগে তোমার উপদেশকে তুচ্ছ মনে করতাম, এখনো ঠিক সেভাবেই তুচ্ছ মনে করি।'

সে এতটুকু কথাই বলেছিল, এমন সময় এক মহারানী কয়েক হাজার রুপি এই দুঃখপ্রকাশসহ পাঠালেন-

'এই পরিমাণ অর্থই এই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল।'

এর অব্যবহিত পরে সেই ব্যক্তির কর্মচারী এল, যার কাছে আমার এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার রুপি ঋণ ছিল। সে এসে বলল- 'আমার মালিক আমাকে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, মওলভী সাহেব রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছেন। তাঁর অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি যেখানে যেতে চান, সেখানে পৌঁছানোর এবং তাঁর মালপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা যেন আমি করি।'

তখন সেই হিন্দু ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে বলল-

'এই বোকাটাকে দেখো! নিজের ঋণ তো দাবি করলই না, উল্টো আরও অর্থ দেওয়ার জন্য নিজের কর্মচারীকে নির্দেশ পাঠিয়েছে!'

এরপর সে বলল- 'আসলে পরমেশ্বরের দরবারেও পক্ষপাত আছে। আমরা সারাদিন পরিশ্রম করি, তবুও কখনো সখনো কয়েক রুপি দেখতে পাই। আর মওলভী সাহেব এমন ব্যক্তি যে, তাঁর প্রয়োজনের জন্য না চাইতেই অর্থ চলে আসে।'

হযরত খলীফা আউয়াল রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন যে, এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে-লেখক) বসেই আল্লাহ তাআলা আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। এ কথা আমি বহুবার স্বয়ং হযরতের মুখ থেকে শুনেছিলাম। কিন্তু আমার বুঝে আসত না যে, এত বিপুল পরিমাণ অর্থ-যা বর্তমান সময়ে বিশ লক্ষ রুপির সমান ছিল-কোথা থেকে হুজুরের নিকট বসে বসেই পৌঁছে গেল।

এ সম্পর্কে সম্মানিত মালিক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব কসূরী (রা.), মরহুম ও মাগফুর, একবার আমাকে বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন যে, কাশ্মীর রাজ্যে প্রতি বছর কাঠের নিলাম হতো। সে বছর কাঠের নিলামের জন্য মহারাজা টেন্ডার আহ্বান করেন। যার টেন্ডার মহারাজা অনুমোদন করেন, তাকে এই শর্তে অনুমোদন করা হয় যে, কাঠ বিক্রি করে যত লাভ হবে, তার অর্ধেক হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবকে দিতে হবে। আল্লাহর কী প্রজ্ঞা! সে বছর ঐ ব্যক্তির তিন লক্ষ নব্বই হাজার রুপি লাভ হয়েছিল, যার মধ্যে শর্তানুযায়ী আমাকে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার রুপি প্রদান করা হয়। এভাবেই আমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়।

মালিক (গোলাম মুহাম্মদ) সাহেব মরহুম আরও আমাকে বলেছিলেন যে, পরের বছরও মহারাজা যার টেন্ডার অনুমোদন করেছিলেন, তার উপরও একই শর্ত আরোপ করেন যে, লাভের অর্ধেক মওলভী সাহেবকে দিতে হবে।

মালিক সাহেব মরহুম বলেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল তাঁকে বলেননি যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বা পরবর্তী ব্যক্তির কত লাভ হয়েছিল। কিন্তু যখন লাভের অর্ধেক অংশ হযরত খলীফা আউয়ালের নিকট পাঠানো হয়, তখন তিনি এই বলে টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন যে- "গত বছর আমি এই অর্থ গ্রহণ করেছিলাম, কারণ আমার রব আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যখন সেই ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে, তখন এখন আমি আর কোনো অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অধিকারী নই।"

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল সম্পর্কে বলেন-

"আমি আমার আত্মিক ভ্রাতার উল্লেখ করতে অন্তরে প্রবল উদ্দীপনা অনুভব করি, যার নাম তাঁর নূরে ইখলাসের মতোই নূরুদ্দীন। তিনি তাঁর হালাল সম্পদ ব্যয় করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব ধর্মীয় সেবা করে যাচ্ছেন, আমি তা সর্বদা ঈর্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখি এবং মনে করি, আহা! যদি আমিও এমন সেবাগুলো করতে পারতাম... তিনি আমার পথে শুধু সম্পদই নয়, বরং জীবন ও সম্মান পর্যন্ত কোরবানি করতে কুণ্ঠিত নন।" (ফতেহ ইসলাম)

তারীখে আহমদিয়ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬-এ ঋণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে এটাও উল্লেখ আছে যে, দ্বিতীয়বার লাভের অর্ধেক আগের থেকেও বেশি ছিল। আরও উল্লেখ আছে যে, কাশ্মীর থেকে এই অর্থ পাঠানো হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে। ********

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

খিলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আলাইহিস সালাম)-এর আগমনের বিষয়ে বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-জুমুআতে কুরআন পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছে। এই দ্বিতীয় আগমন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবশ্যই ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের রূপে সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল। সূরা আস-সাফে ইসলামকে সকল ধর্ম ও মতের উপর বিজয়ী হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেছেন যে এই বিজয় প্রতিশ্রুত মসীহের মাধ্যমে অর্জিত হবে। কুরআন কারীমের আরও বহু স্থানে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমনের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হাদীসের গ্রন্থসমূহেও প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র নবী (সা.) বলেছেন:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(সহীহ বুখারী, কিতাব আহাদীস আল-আনবিয়া, বাব নুযুল ঈসা ইবন মারিয়াম, হাদীস নং ৩৪৪৯)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে পবিত্র নবী ? বলেছেন: "তোমাদের অবস্থা কী হবে যখন মরিয়মের পুত্র তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবে এবং সে তোমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং তোমাদের ইমাম হবে?

অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীসে পবিত্র নবী (সা.) বলেছেন যে আল্লাহ তা'আলা আমার মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন নির্ধারণ করেছেন এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে তিনি এই নিদর্শন আর কারও জন্য নির্ধারণ করেননি। এরপর নবী ? তাঁর মাহদীর জন্য নির্দিষ্ট রমযান মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন।

(সুনান দার কুতনী, বাব সিফাত সালাত আল-খুসুফ ওয়াল-খুসুফ ও হায়আতিহিমা, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৮, মুদ্রণ: মাতবাআ আনসারী, দিল্লী, ১৩১০ হিজরী)

হাদীস থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ একই ব্যক্তির দুটি নাম। যেমন ইবনে মাজাহ, কিতাব শিদ্দাত আল-যামান-এ একটি হাদীস আছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ ، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ-

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ? বলেছেন: "দিন দিন পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে, পৃথিবী ধ্বংসের দিকে যাবে, মানুষ আরও কৃপণ হবে, এবং কিয়ামত কেবলমাত্র নিকৃষ্ট লোকদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং ঈসা ইবন মারিয়াম ব্যতীত কোনো মাহদী নেই।"

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব শিদ্দাত আল-যামান, হাদীস নং ৪০৩৯)

সারসংক্ষেপে, পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি নিশ্চিত ও অবধারিত বিষয়। এটিও জানা যায় যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ দুইটি পৃথক সত্তা হবেন না, বরং একটি মাত্র সত্তা হবেন।

প্রশ্ন ওঠে যে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের মর্যাদা কী হবে। স্পষ্ট থাকা উচিত যে তিনি হবেন একজন উম্মতী নবী। পবিত্র নবী (সা.)-এর পবিত্র বাণী থেকে বোঝা যায় যে তাঁর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক হবে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈসা ইবন মারিয়ামকে পায়, সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছে দেয়।" (আল-দুররুল মানসুর, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫)

এবং আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে: "তোমরা যখন তাকে দেখবে, তখন তার হাতে বায়আত গ্রহণ করো, যদিও তোমাদের বরফে ঢাকা পাহাড় অতিক্রম করে হাঁটু গেড়ে যেতে হয়।"

(মুস্তাদরাক হাকিম, কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম, বাব খুরুজ আল-মাহদী)

এবং ইসলামী আলেমগণ বলেছেন যে যে ব্যক্তি ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এই সব বিষয় থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ইমাম মাহদী নবুওয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন; তাই তাঁর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক ও অপরিহার্য হবে, এবং যে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করবে না সে কাফির হয়ে যাবে। ইসলামে মানবসম্পর্কিত যে একমাত্র পদমর্যাদায় ঈমান আনা ফরজ, তা হলো নবুওয়ত। অতএব আল্লাহ তা'আলার আদেশে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ নবুওয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। তবে এটি সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা উচিত যে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে উম্মতী নবী ব্যতীত আর কোনো ধরনের নবী আসতে পারে না। সুতরাং ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন উম্মতী নবী।

এই অনুযায়ী, কাদিয়ানের হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম), প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর দাবি হলো যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি একজন উম্মতী নবী। উম্মতী নবীর অর্থ হলো তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র নবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ, পূর্ণ আনুগত্য ও গভীর প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে অর্জন করেছেন। যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন, কুরআনী জ্ঞানের যে সমুদ্র তিনি প্রবাহিত করেছেন, এবং যে ধর্মীয় খেদমত তিনি সম্পাদন করেছেন-সবকিছুই নবী (সা.)-এর অনুসরণের ফলস্বরূপ তাঁর নসীব হয়েছে। এটাই উম্মতী নবীর অর্থ।

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর নামে তাঁর সত্যতার শপথ করে বলেছেন:

"যেমন আমি বারবার উল্লেখ করেছি, এই কালাম যা আমি বর্ণনা করি তা নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে আল্লাহর কালাম, যেমন কুরআন ও তাওরাত আল্লাহর কালাম, এবং আমি ছায়া ও প্রতিবিম্বরূপে নবী, এবং ধর্মীয় বিষয়ে আমার আনুগত্য প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, এবং প্রতিশ্রুত মসীহকে গ্রহণ করা আবশ্যক। আর যার কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছেছে, সে যদি মুসলমান হয় কিন্তু আমাকে তার বিচারক হিসেবে গ্রহণ না করে, অথবা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে না মানে, অথবা আমার ওহীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে না জানে, তবে সে আসমানে জবাবদিহির যোগ্য, কারণ সে সেই বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে যা তার সময়ে গ্রহণ করা উচিত ছিল। আমি শুধু এটুকুই বলি না যে আমি মিথ্যাবাদী হলে ধ্বংস হবো, বরং আমি এটাও বলি যে মূসা, ঈসা, দাউদ এবং নবী (স.)-এর মতোই আমি সত্যবাদী, এবং আমার সত্যতার জন্য আল্লাহ দশ হাজারেরও বেশি নিদর্শন দেখিয়েছেন। কুরআন আমার সাক্ষ্য দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সাক্ষ্য দিয়েছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ আমার আগমনের সময় নির্ধারণ করেছেন, যা এই একই যুগ, এবং কুরআনও আমার আগমনের সময় নির্ধারণ করেছে, যা এই একই যুগ। আসমানও আমার সাক্ষ্য দিয়েছে, জমিনও আমার সাক্ষ্য দিয়েছে, এবং এমন কোনো নবী নেই যিনি আমার জন্য সাক্ষ্য দেননি। এবং আমি যে দশ হাজার নিদর্শনের কথা বলেছি তা কেবল সংক্ষিপ্ততার জন্য; নতুবা আমি সেই সত্তার কসম করে বলি, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি আমার সত্যতার প্রমাণ হাজার খণ্ডের একটি সাদা বইয়ে লিখতে চাই, আমি নিশ্চিত যে বই শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সেই প্রমাণ শেষ হবে না।"

(তুহফাতুন নাদওয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১৯, পৃ. ৯৫)

এখন যেহেতু তিনি উম্মতী নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পর খিলাফতের ব্যবস্থা চলমান থাকা আবশ্যক ছিল। এবং এর ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র নবী ? চৌদ্দশ বছর আগেই করেছিলেন। যেমন, তিনি বলেছেন:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ-

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, ততক্ষণ তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতির উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তা ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। অতঃপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর হবে কুরে-কুরে খাওয়া রাজতন্ত্র, এবং তা ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। অতঃপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা, এবং তা ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। অতঃপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর আবার নবুওয়তের পদ্ধতির উপর খিলাফত ফিরে আসবে।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।

(মুসনাদ আহমদ, প্রথম খণ্ড, মুসনাদ আল-কূফিয়্যীন, হাদীস নং ১৮৪০৬)

এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন:

مَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১৯)

অর্থ: প্রতিটি নবুওয়তের পর অবশ্যই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব, এটি আবশ্যক ছিল যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর ওফাতের পর তাঁর জামাতে খিলাফতের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আলাইহিস সালাম)-এর ২৬ মে ১৯০৮ সালের ওফাতের পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ২৭ মে ১৯০৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতে, জামাতে আহমদিয়ায়, আল্লাহর ফযল

ও করমে খিলাফতের ব্যবস্থা শুরু হয়। প্রথম খলিফা হন হযরত মাওলানা হাকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)। জামাতে আহমদিয়ায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আলাইহিস সালাম) নিজেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাঁর জামাতকে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি এটাও বলেছেন যে খিলাফতের এই নিয়ামত তাদের মধ্যে চিরকাল অব্যাহত থাকবে।

বর্তমানে হযরত মির্জা গুলাম আহমদের, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আলাইহিস সালাম)-এর পঞ্চম খলিফা হযরত মির্জা মসরুর আহমদ সমগ্র বিশ্বের আহমদিয়া জামাতসমূহকে আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর বরকতময় অস্তিত্বের মাধ্যমে কেবল জামাতে আহমদিয়ার সদস্যরাই উপকৃত হচ্ছেন না, বরং তাঁর আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা ও দোয়াও সমগ্র বিশ্বকে উপকৃত করছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খিলাফতের এই আধ্যাত্মিক নিয়ামত থেকে সর্বাধিক উপকার গ্রহণের তাওফীক দান করুন, এবং আমরা যেন এই মহান নিয়ামত দ্বারা আমাদের জীবন পূর্ণ করতে পারি।

খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন:

"এটি আল্লাহ তা'আলার সুন্নত, এবং তিনি যখন থেকে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিনি এই সুন্নত প্রকাশ করে আসছেন যে তিনি তাঁর নবী ও রাসূলদের সাহায্য করেন এবং তাদের বিজয় দান করেন, যেমন তিনি বলেন: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ (আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন: আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো)। এবং বিজয় দ্বারা বোঝানো হয়েছে, যেমন নবী ও রাসূলদের উদ্দেশ্য থাকে যে আল্লাহর হুজ্জত পৃথিবীতে পূর্ণ হয়ে যাক এবং তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে না পারে, ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী নিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রকাশ করেন এবং তারা পৃথিবীতে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চান, তার বীজ তারা নিজের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তার পূর্ণ পরিপূর্ণতা তিনি তাদের দ্বারা সম্পন্ন করেন না; বরং এমন সময়ে তিনি তাদের মৃত্যু দান করেন যা বাহ্যত ব্যর্থতার ভয় সৃষ্টি করে, ফলে বিরোধীদের জন্য উপহাস, বিদ্রূপ ও তিরস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এবং যখন তারা উপহাস শেষ করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটান এবং এমন উপায় সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যগুলো কিছুটা অসম্পূর্ণ ছিল, তা পূর্ণতায় পৌঁছে যায়।

সংক্ষেপে, তিনি দুই প্রকারের শক্তি প্রকাশ করেন: (১) প্রথমে তিনি নবীদের হাতেই তাঁর শক্তি প্রকাশ করেন; (২) দ্বিতীয়ত, নবীর মৃত্যুর পর যখন কঠিনতা দেখা দেয় এবং শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে মনে করে যে কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং বিশ্বাস করে যে এই জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি কিছু লোক সন্দেহে পড়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কিছু দুর্ভাগ্যবান ধর্মত্যাগের পথ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বিতীয় শক্তিশালী প্রকাশ ঘটান এবং পতনশীল জামাতকে সমর্থন দেন।

অতএব, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে, তারা এই নিদর্শন দেখে, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে ঘটেছিল, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতকে অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল, অনেক বেদুইন ধর্মত্যাগ করেছিল, এবং সাহাবীগণও গভীর শোকে মুষড়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আবু বকর সিদ্দীককে দাঁড় করিয়ে আবার তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটান এবং ইসলামকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন:

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ی

অর্থ: ভয়ের পর আমরা অবশ্যই তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করব এবং তাদের ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করব।

অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়েও একই ঘটনা ঘটেছিল, যখন তিনি বনী ইসরাইলকে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই মিসর থেকে কেনআনের পথে মৃত্যুবরণ করেন, এবং বনী ইসরাইলের মধ্যে চল্লিশ দিন শোক পালিত হয়, যেমন তাওরাতে উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছিল, যখন ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে একজন ধর্মত্যাগও করে।

অতএব, হে প্রিয়জনেরা! যেহেতু আল্লাহর সুন্নত শুরু থেকেই এই যে তিনি দুটি শক্তি প্রকাশ করেন, যাতে শত্রুদের মিথ্যা উল্লাস ধূলিসাৎ হয়, তাই আমার কথায় দুঃখিত হয়ো না এবং তোমাদের হৃদয় অস্থির করো না। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় শক্তির প্রকাশ দেখা আবশ্যক, এবং তা তোমাদের জন্য উত্তম, কারণ তা চিরস্থায়ী, যার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।

এবং এই দ্বিতীয় শক্তি আমার চলে যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি চলে গেলে আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বিতীয় শক্তি প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেমন ব্রাহিনে আহমদিয়ায় প্রতিশ্রুতি আছে। এবং এই প্রতিশ্রুতি আমার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নয়, বরং তোমাদের সম্পর্কে, যেমন আল্লাহ বলেন যে তিনি এই জামাতকে, যারা তোমার অনুসারী, কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর বিজয়ী করবেন।

অতএব, আমার তোমাদের থেকে বিচ্ছেদের দিন আসা আবশ্যক, যাতে তার পরে চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন আসে। আমাদের আল্লাহ সত্যবাদী, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং সত্য। তিনি তোমাদেরকে সবকিছু দেখাবেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। যদিও এগুলো দুনিয়ার শেষ দিন এবং বহু বিপদ আসার সময়, তবুও এই পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক যতক্ষণ না আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত সংবাদ পূর্ণ হয়।

আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর শক্তির একটি রূপে প্রকাশিত হয়েছি, এবং আমি তাঁর এক মূর্ত প্রতীক। এবং আমার পরে আরও কিছু ব্যক্তি আসবে যারা দ্বিতীয় শক্তির প্রকাশ হবে। অতএব, তোমরা একত্র হয়ে দোয়া করতে থাকো দ্বিতীয় প্রকাশের অপেক্ষায়। এবং প্রত্যেক দেশের নেককারদের উচিত একত্র হয়ে দোয়া করা, যাতে আসমান থেকে দ্বিতীয় শক্তি অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদের দেখায় যে তোমাদের আল্লাহ ক্ষমতাবান। তোমাদের মৃত্যুকে নিকট মনে করো; তোমরা জানো না কখন সেই মুহূর্ত এসে যাবে।"

এবং এটি আবশ্যক যে জামাতের সেই প্রবীণ ব্যক্তিরা, যাদের আত্মা পবিত্র, তারা আমার নামে এবং আমার পরে মানুষের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা চান যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সকল আত্মা-ইউরোপে হোক বা এশিয়ায়-যারা সৎ প্রকৃতির অধিকারী, তাদেরকে তাওহীদের দিকে আকর্ষণ করা হোক এবং তাঁর বান্দাদের এক ধর্মের উপর একত্র করা হোক। এটাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, যার জন্য আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ করো, তবে কোমলতা, উত্তম চরিত্র এবং দোয়ার প্রতি গুরুত্বসহকারে। আর যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়ে কেউ দাঁড়ায়, ততক্ষণ আমার পরে তোমরা সবাই মিলিতভাবে কাজ করতে থাকো।

(রিসালাতুল ওসিয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৭)

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

কিছু লোক وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"এই আয়াতের সাধারণ অর্থ অস্বীকার করে বলে যে "মিনকুম" দ্বারা কেবল সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে, এবং সত্যিকার ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খিলাফত তাদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে, এরপর কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে এই খিলাফতের কোনো চিহ্ন থাকবে না। তাদের মতে এই খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর একটি স্বপ্নের মতো ছিল, এরপর (নাউযুবিল্লাহ) ইসলাম চিরতরে এক অপূরণীয় দুর্দশায় পতিত হয়েছে।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি: কোনো সৎ হৃদয়ের মানুষ কি এমন মত গ্রহণ করতে পারে যে হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়তের বরকত এবং তাঁর খিলাফত প্রায় চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, অথচ সেই নবীর ক্ষেত্রে-যিনি "সকল রাসূলের শ্রেষ্ঠ" এবং "খাতামুন নাবিয়্যীন-যার শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত, তাঁর বরকত কেবল তাঁর নিজের সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, এবং আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেননি যে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁর বরকতকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রকাশ করবে? এ ধরনের কথা শুনলে আমাদের শরীর কেঁপে ওঠে। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু লোক, যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে, তারা সাহস ও অসতর্কতার সাথে এমন অবমাননাকর কথা বলে যেন ইসলামের বরকত বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে।

আর "মিনকুম" শব্দ থেকে এই যুক্তি করা যে যেহেতু সম্বোধন সাহাবীদের দিকে, তাই খিলাফত কেবল তাদের যুগেই সীমাবদ্ধ-এটি এক অদ্ভুত যুক্তি। যদি কুরআনের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়, তবে ইহুদিদের ব্যাখ্যার সীমাও অতিক্রম করতে হবে। স্পষ্ট থাকা উচিত যে "মিনকুম" শব্দটি পবিত্র কুরআনে প্রায় বিরাশি স্থানে এসেছে, এবং দুই-তিনটি স্থান ছাড়া যেখানে বিশেষ প্রেক্ষাপট নির্ধারিত হয়েছে, বাকি সব স্থানে "মিনকুম" দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩০)

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

এবং বলা যে একটি হাদীস আছে যে খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর থাকবে-এটি এক অদ্ভুত ধারণা, অথচ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে:

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخَرِيْنَ

অতএব যদি কোনো হাদীস কুরআনের বিপরীতে উপস্থাপন করা হয় এবং তার অর্থ কুরআনের বিরোধীভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে এটি কেমন বোঝাপড়া? যদি হাদীস গ্রহণ করতে হয়, তবে সেই সকল হাদীস আগে গ্রহণ করা উচিত যা এই বর্ণনার চেয়ে বহু গুণ বেশি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য-যেমন সহীহ বুখারীর সেই বর্ণনাসমূহ যেখানে শেষ যুগের খলিফাদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, বিশেষত সেই খলিফার কথা, যার সম্পর্কে বুখারীতে উল্লেখ আছে যে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ হবে: "এই হলো খলিফাতুল্লাহ আল-মাহদী।"

(এরপর শেষের পাতায়...)

ইবাদত প্রতিষ্ঠা খিলাফতে আহমদীয়ার সম্পর্কযুক্ত

আজিজ আহমদ নাসির, মুরুব্বী সিলসিলা

আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর ইবাদতকে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(সূরা আয–যারিয়াত: ৫৭)

অর্থাৎ: আমি জিন ও মানুষকে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।

এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া, বুঝানো এবং মানুষকে সর্বদা এর প্রতি মনোযোগী রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী ও রাসূল প্রেরণ করতে থেকেছেন। তিনি বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: 37)

অর্থাৎ: নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাক।

কোনো নবীর ওফাতের পর তাঁর মিশন খিলাফতের ছায়াতলে অব্যাহত থাকে। রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন–

مَا مِنْ نُبُوَّةٍ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৯)

অর্থাৎ: এমন কোনো নবুওয়ত অতিবাহিত হয়নি, যার পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আয়াতে ইস্তিখলাফে আল্লাহ প্রদত্ত খলীফাদের একটি স্পষ্ট নিদর্শন এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

অর্থাৎ: তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।

এই আয়াতের অব্যবহিত পরে আল্লাহ তাআলা খিলাফতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور 57)

অর্থাৎ: আর নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (সূরা আন–নূর: ৫৭)

মুবারক হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) মুসলিম উম্মতের মধ্যে দুইবার আলা মিনহাজিন নুবুওয়ত খিলাফত প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়েছিলেন–প্রথমবার তাঁর ওফাতের অব্যবহিত পরে, এবং দ্বিতীয়বার শেষ যুগে। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ খিলাফতে আহমদিয়া চলমান রয়েছে।

খিলাফতে রাশেদার একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহর ইবাদত, বিশেষত নামায। খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেরাও নামায ও দোয়ায় অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন এবং উম্মতের মধ্যেও এই স্পৃহা বজায় রেখেছিলেন। তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস ঈমান–উদ্দীপক ইবাদতের ঘটনাবলিতে সুশোভিত। আসুন, এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দিই।

আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর (রা.)–কে রাসূলে মকবূল (সা.)–এর পবিত্র জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলোতে নামাযের ইমামতি করার সম্মান দান করেছিলেন। যেন এর মাধ্যমে খিলাফতের মহান পদে তাঁর অধিষ্ঠানের ঘোষণা করা হচ্ছিল।

হযরত উমর (রা.) জামাতে নামায আদায়ের ব্যাপারে এতটাই যত্নবান ছিলেন যে–

أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالًا بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ

অর্থাৎ: হযরত উমর (রা.) কিছু লোককে কাতার সোজা করার দায়িত্ব দিতেন। মুয়াজ্জিন ততক্ষণ পর্যন্ত ইকামত বলতেন না, যতক্ষণ না তাকে জানানো হতো যে কাতারগুলো সোজা হয়েছে।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, হাদীস ২২৭ অবলম্বনে)

হযরত উসমান (রা.) তাঁর বিরোধীদের যেসব কথায় সতর্ক করেছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে খিলাফত ও ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সুন্দর প্রতিফলন। তিনি বলেন–

যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর, তবে আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমরা কখনো পারস্পরিক ভালোবাসায় থাকতে পারবে না, কখনো একত্রে নামায পড়তে পারবে না, এবং কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।

(তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, প্রসিদ্ধ তারীখে তাবারী)

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) একবার বলেছিলেন–

নামায আলীর কাছে উত্তম হয়, আর রুটি মু'আবিয়ার কাছে উত্তম মেলে।

(কিতাব খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা ১৯৪ অবলম্বনে)

কিন্তু খিলাফতে রাশেদার অবসান মুসলিম বিশ্বের উপর অত্যন্ত গভীর আঘাত হেনেছিল। কবির ভাষায়–

মসজিদগুলো শোকগাথা পাঠ করছে যে নামাযী আর রইল না,

অর্থাৎ হিজাজের সেই গুণাবলির অধিকারীরা আর অবশিষ্ট নেই।

এই করুণ অবস্থা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত সময়ে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (সা.)–কে উম্মতী নবীর পোশাক পরিয়ে মসীহে মওউদ ও মাহদী মাওউদ উপাধিতে প্রেরণ করেন। যাঁকে মহানবী (সা.) একটিমাত্র হাদীসে চারবার নবিয়ুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

অতএব, হযরত আকদাস (আ.) নিজের মর্যাদা ও অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

"খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে দুটি নাম দেওয়া হয়েছে। একটি, আমার নাম রাখা হয়েছে 'উম্মতী', যেমন আমার নাম 'গোলাম আহমদ' থেকেই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, আমার নাম ছায়াগতভাবে 'নবী' রাখা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বরাহীন আহমদিয়ার পূর্ববর্তী অংশসমূহে আমার নাম 'আহমদ' রেখেছেন। এবং এই নামেই আমাকে বারবার সম্বোধন করেছেন। আর এতে এদিকেই ইঙ্গিত ছিল যে, আমি ছায়াগতভাবে নবী।"

"অতএব আমি উম্মতীও, আবার ছায়াগতভাবে নবীও।"

(রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৩৬০)

আরও, হযরত আকদাস (আ.) তাঁর মিশন সম্পর্কে বলেন–

"যে কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা হলো, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কে যে কলুষতা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।"

(রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৮০)

আমাকে তিনি নিজেই দিয়েছেন পবিত্র তাওহীদের ঝর্ণাধারা,

যাতে আবার নতুন করে ধর্মের বাগানে লাল ফুল ফুটে ওঠে।

যাই হোক, নিজের সফল মিশন সম্পন্ন করার পর ২৬ মে ১৯০৮ সালে তিনি এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করেন। আর পরদিনই আল্লাহ তাআলা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুনরায় এখানে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠা করেন।

খিলাফতে আহমদিয়ার শতবর্ষের ইতিহাস এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, আহমদিয়ার খলীফাগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইবাদতে ইলাহীর প্রতিষ্ঠা।

খিলাফতে উলা ও ইবাদতে ইলাহী

আল্লাহ তাআলা হযরত হাকীম মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)–কে প্রথম খলীফাতুল মসীহ হওয়ার সম্মান দান করেন। তাঁর যুহদ ও তাকওয়ার সাক্ষ্য সমগ্র বিশ্ব দেয়। সে সময়কার সকল মুমিনদের মধ্যে ইবাদতে ইলাহীর দিক থেকে তাঁর মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র ও অনন্য।

এমনকি হযরত মসীহে মওউদ (আ.) সর্বদা তাঁর নেতৃত্বে নামায আদায়কেই অগ্রাধিকার দিতেন। এবং অধিকাংশ বিষয়ে, বিশেষত ফিকহি মাসআলায়, তাঁর কাছ থেকেই পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

নামায ও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নৈকট্য ও নির্জনতার জন্য তাঁর গৃহেও একটি বাইতুদ দোআ ছিল। তিনি জামাআতে আহমদিয়াকে সর্বদা নামাযের প্রতি মনোযোগী রাখার চেষ্টা করতেন।

তিনি বায়আতের শব্দসমূহে, অর্থাৎ বায়আতকারীদের অঙ্গীকারে নিম্নোক্ত বাক্য সংযোজন করেন–

"আমি নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা করব এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যাকাত ও হজ্জ আদায় করতে সদা প্রস্তুত থাকব।"

(হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

মসজিদ নূরের জন্য আহ্বান

খিলাফতে উলার যুগের তিনটি আর্থিক তহরীকের সম্পর্ক ছিল মাদরাসা তা'লীমুল ইসলাম–এর সঙ্গে। মাদরাসার নিজস্ব ভবনের পাশাপাশি একটি বোর্ডিং হাউস এবং 'একটি মসজিদ'–এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। (তারীখে আহমদিয়ত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১২)

জুমার দিনে ছুটি

জুমার দিনে ছুটির প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে দিল্লিতে ভারতের সম্রাট জর্জ পঞ্চম–এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে একটি মেমোরিয়াল পেশ করেন, যা ভারতের ভাইসরয়ের মাধ্যমে ব্রিটেনের সম্রাটের নিকট পৌঁছানো হয়। এতে এই আবেদন করা হয় যে, মুসলমানদের যেন প্রতি জুমায় নামাযে জুমা আদায়ের জন্য দুই ঘণ্টার ছুটি দেওয়া হয়।

(তারীখে আহমদিয়ত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৯–৩৮১ অবলম্বনে)

বেহরে নামাযে জুমা ইয়ে হো এহতিমামে খাস

সব জান লেঁ কে ওজহে মাসাররাত নামায হ্যায় (কালামে মুখতার)

অর্থাৎ:জুমার নামাযের জন্য থাকুক বিশেষ ব্যবস্থা,

সকলেই জেনে নিক–প্রকৃত আনন্দের কারণ নামায।

খিলাফতে সানিয়া ও ইবাদতে ইলাহীর প্রতিষ্ঠা

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর ৫২ বছরের খিলাফতের যুগ, ইবাদত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মাইলফলকস্বরূপ। তিনি ইবাদতসমূহ–যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ–সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ভাষায় শুধু এর হিকমতই ব্যাখ্যা করেননি, বরং এর তদারকির জন্যও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

ইবাদতের তহরীক

নামায মুমিনের মি'রাজ। এজন্য হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সকল নির্দেশনাই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক এবং নামাযকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো।

হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) ১১ আগস্ট ১৯৫৫ সালে যুবক আহমদীদের উদ্দেশে এই তহরীক করেন-

"তারা যেন তাকওয়া ও ইবাদতের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং এত বেশি ইবাদত করে যে আসমানের দরজাগুলো তাদের জন্য খুলে যায় এবং তাদের উপর ইলহাম নাযিল হওয়া শুরু হয়ে যায়।"

(আল-ফযল, ১৭ নভেম্বর ১৯৫৫)

যিকরে ইলাহীর তহরীক

হুযূর? ১২ মে ১৯৪৪ সালে তহরীক করেন যে, আহমদীরা যেন নামাযগুলো সুন্দরভাবে ও জামাআতে আদায় করে এবং প্রতিদিন কমপক্ষে বারোবার তাসবীহ, তাহমীদ ও দরূদ শরীফ পাঠ করার নিয়ম পালন করে।

শিশুদের রক্তপিপাসু ও হত্যাকারী

হুযূর বলেন-

"বড় মানুষ যদি নিজে জামাআতে নামায না পড়ে তবে সে মুনাফিক। কিন্তু যারা নিজেদের সন্তানদের জামাআতে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে না, তারা তাদের সন্তানদের রক্তপিপাসু ও হত্যাকারী। যদি মা-বাবা সন্তানদের জামাআতে নামাযের অভ্যাস করিয়ে দেন, তবে কখনো এমন সময় আসতে পারে না যে বলা হবে-তাদের সংশোধন অসম্ভব হয়ে গেছে এবং তারা আর চিকিৎসাযোগ্য নেই।"

(আল-আযহার লিযাওয়াতিল খিমার, সংকলন: হযরত সাইয়্যিদা মরিয়ম সিদ্দীকা, পৃষ্ঠা ১৬৮)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) নামাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং তিনি শুধু জামাআতের সদস্যদের সময়মতো ও জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করার উপদেশই দেননি, বরং নিজের ঘর থেকেই এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) লিখেছেন:

"আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার আমরা পাঁচ-ছয়জন শিশু কোনো খেলায় ব্যস্ত ছিলাম এবং জামাআতের সঙ্গে আসরের নামাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। হুযুর নামাজ পড়িয়ে ফিরে এসে আমাদের খেলতে দেখলেন, সবাইকে একত্র করলেন এবং হযরত আম্মি জানের উঠানে নিয়ে গেলেন, সেখানে আমাদের এক সারিতে দাঁড় করালেন শারীরিক শাস্তি দেওয়ার জন্য। যেন জামাআতের নামাজে অনুপস্থিত থাকার শাস্তিও জামাআতের সঙ্গে নির্ধারিত হয়েছিল। হুযুরের এই আগ্রহ শৈশব থেকেই ছিল, এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে খুব অল্প বয়সেই তিনি রাতে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করতেন, ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করতেন এবং নিজের অশ্রুতে সিজদার স্থান ভিজিয়ে দিতেন।"

(মাসিক খালিদ, নভেম্বর ১৯৭৫)

মসজিদ নির্মাণের আহ্বান

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর শুধু নামাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিই নয়, মসজিদ নির্মাণের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমনকি তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৫২-এ বিদেশে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

"ইউরোপীয় দেশসমূহে মসজিদ তাবলিগের একটি অপরিহার্য অংশ।"

(রিপোর্ট মজলিসে শূরা ১৯৫২, পৃ. ২০)

তিনি আরও বলেন:

"ছয়টি দেশ আছে (United States, Netherlands, Germany, Italy, Spain Ges France), যেখানে যদি আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়, তবে তা তাবলিগের এক বিরাট মাধ্যম প্রমাণিত হতে পারে। যদি এসব মসজিদের ব্যয় সাত লাখ রুপি ধরা হয় এবং আমরা বাজেটে বছরে এক লাখ রুপি মসজিদ নির্মাণের জন্য রাখি, তাহলে সাত বছরে-আর যদি পঞ্চাশ হাজার রুপি রাখি, তাহলে চৌদ্দ বছরে-এই অর্থ পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক, কিছু না কিছু হওয়া উচিত, যাতে আমরা আমাদের তাবলিগের কাজ বিস্তৃত করতে পারি এবং মানুষের সমবেত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।" (রিপোর্ট মজলিসে শূরা ১৯৫২, পৃ. ২১)

মসজিদ নির্মাণের চাঁদার স্থায়ী ব্যবস্থা

একই উপলক্ষে হুযুর মসজিদ নির্মাণের চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রস্তাব করেন:

১. চাকরিজীবীরা তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির প্রথম মাসের বাড়তি অংশ দান করবেন।

২. বড় পেশাজীবীরা এক মাসের আয়ের পাঁচভাগের একভাগ দান করবেন।

৩. ছোট পেশাজীবীরা মাসের নির্দিষ্ট এক দিনের মজুরির দশভাগের একভাগ দান করবেন।

৪. ব্যবসায়ীরা মাসের প্রথম লেনদেনের লাভ এই খাতে দান করবেন।

৫. জমির মালিকরা প্রতি ফসলের সময় প্রতি একর জমি থেকে এক করম পরিমাণ চাঁদা মসজিদ নির্মাণে দেবেন।

(আল-ফযল, ১৭ এপ্রিল ১৯৫২)

দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে ইউরোপে পাঁচটি মসজিদ নির্মিত হয়:

* ফজল মসজিদ (১৯২৪)
* মুবারক মসজিদ (১৯৫৫)
* ফজলে উমর মসজিদ (১৯৫৭)
* নুর মসজিদ (১৯৫৯)
* মাহমুদ মসজিদ (১৯৬৩)

সর্বমোট তাঁর খিলাফতকালে প্রায় ৩১১টি মসজিদ নির্মিত হয় অথবা সম্প্রসারিত হয়। এর মধ্যে Mubarak Mosque, Netherlands-এর মসজিদসমূহ এবং United States-এর মসজিদসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

আমাদের আজানের উপরও যেন সূর্য অস্ত না যায়!

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "যখন ইউরোপ ও আমেরিকার হাজার হাজার মসজিদে আজান হবে, তখন খ্রিস্টানরা বুঝবে যে খ্রিস্টধর্ম মরে গেছে। এরপর এই নূর ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, ঘুরতে ঘুরতে জাপান, ফিলিপিন এবং ইন্ডোনেশিয়া হয়ে পাকিস্তানে পৌঁছাবে। আগে মানুষ বলত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু এখন এই কথা বাস্তবিক অর্থে আহমদিয়াতের ক্ষেত্রেও সত্য। এখন আহমদিয়াতের উপরও সূর্য অস্ত যায় না, তবে আমরা চাই আমাদের আজানের উপরও যেন সূর্য অস্ত না যায়।"(আল-ফযল, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সূত্রে)

বেদনার উপত্যকা থেকে যে সূর্য উদিত হয়েছিল, আল্লাহ করুন নবুয়তের সেই নূর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকুক।

যাকাত আদায়

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

"এই ঈদ আসে আমাদের হৃদয় জাগ্রত করার জন্য এবং আমাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। ঈদ আমাদের বলতে আসে যে, হজ্জ তোমাদের উপর ফরজ, যেমন নামাজ একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য (ফরজ), যেমন যাকাত একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য (ফরজ), যেমন রোজা একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য (ফরজ)। তেমনিভাবে হজ্জও একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য (ফরজ)।"

(জুমার খুতবা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫২)

তিনি আরও বলেন:

"মনে রাখা উচিত যে এই কর, যাকে যাকাত বলা হয়, তা শুধু আয়ের উপর নয়; বরং মূলধন ও লাভ উভয়কে মিলিয়ে এর উপর ধার্য করা হয়। এভাবে আড়াই শতাংশ কখনো কখনো বাস্তবে লাভের পঞ্চাশ শতাংশ হয়ে যায়।"

(আহমদিয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ৮, পৃ. ৩০৬ সূত্রে)

তিনি আরও জোর দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সব অর্থ বায়তুল মালে জমা করা উচিত।

তোমার কাছে যদি সম্পদ থাকে, তবে তা থেকে যাকাত ও সদকা দাও;

দরিদ্রের চিন্তা রাখো, আর দুনিয়ার দুঃশ্চিন্তায় ডুবে থেকো না।

হজ্জ পালনের প্রতি তাগিদ

হযরত মুসলেহে মওউদ (রা.) হজ্জের ফরয আদায়ের জন্য জোরালোভাবে তাগিদ প্রদান করেন। সেই অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ১ সেপ্টেম্বর জুমআর খুতবায় তিনি বলেন:

"এই ঈদ এদিকেও ইঙ্গিত করে যে, যখন আমরা আমাদের ভাইদের দেখি, তখন আমাদের মধ্যেও হজ্জ করার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া উচিত। আমাদের কোনো কোনো ভাই হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে-এ খবর শুনে যেমন আমরা আনন্দিত হই, তেমনি আমাদের এ চিন্তাও করা উচিত যে, আমরা কেন হজ্জ করব না? আমাদের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরও হজ্জের সুযোগ দান করুন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষের দৃষ্টি হজ্জ থেকে সরে গেছে। খুব অল্প লোকই হজ্জে যায়।"

(আল-ফযল, ৩ অক্টোবর ১৯৫২)

"হজ্জ একটি অত্যন্ত জরুরি ফরয। নতুন শিক্ষার মোহে যারা মুগ্ধ, তারা এ বিষয়ে খুবই গাফেল, অথচ ইসলামের উন্নতির উপায়সমূহের মধ্যে এটি একটি বড় উপায়। হজ্জের সামর্থ্য বলতে কোটি কোটি টাকা থাকা বোঝায় না। সাধারণ অবস্থার একজন মানুষও যদি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করে, তবে হজ্জের ব্যবস্থা করতে পারে।"

(কলামে মাহমুদ ফারহাঙ্গী থেকে)

এর সৌন্দর্য তোমার কাছে কখনও প্রকাশ পাবে না, এটা মনে রেখো,

যদি মুসলমানের কাঁধে ইহরামের চাদর না থাকে।

খিলাফতে সালিসা এবং ইবাদতের প্রসার

হযরত হাফিয মির্জা নাসির আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ তৃতীয় (রহ.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মসজিদ নির্মাণের কাজ আরও ব্যাপকতা লাভ করে। সেই অনুযায়ী 'সুইডেন, নরওয়ে, আমেরিকা, কানাডা, ইতালি, জাপান ও স্পেন, প্রভৃতি দেশে মসজিদ নির্মিত হয়। এর মধ্যে বাশারত মসজিদ, স্পেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, কারণ ৭৫০ বছর পর জামাআতে আহমদিয়াকে প্রথমবারের মতো ঐ ভূখণ্ডে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করা হয়। ফালহামদুলিল্লাহি আলা যালিক।

একইভাবে "বাইতুল্লাহ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য" শীর্ষক তাঁর ধারাবাহিক খুতবা আল্লাহর ইবাদত ও মসজিদ নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী এক মহান কীর্তি।

অসংখ্য খুতবা, ভাষণ ও লিখিত নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি জামাআতের সদস্যদের জামাআতে নামায ও রোযার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিশেষ করে জামাআতের

শতবার্ষিকী জুবিলী তাশাক্কুর উপলক্ষে তিনি দোআ ও নফল ইবাদতের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

যাকাত আদায়

তিনি বলেন:"যাকাত প্রতি বছর আদায় করা জরুরি এবং বিভিন্ন ইবাদতের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত রয়েছে। এখন যদি কেউ বলে, আমি দশ বছর যাকাত দেব না, দশ বছর পরে একবারে সব দিয়ে দেব, তাহলে তার আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা অবশ্যই বজায় থাকতে পারবে না।"

(জুমআর খুতবা, ২২ এপ্রিল ১৯৬৬

যা কিছু বলি জিহ্বা দিয়ে, হে নাসির, তা কাজে প্রমাণ করি;

হে আল্লাহ! রহম করো, যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করি।

(হায়াতে নাসির, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

খিলাফতে রাবিয়া-তে কিয়ামে-ইবাদত ও মসজিদ নির্মাণ

হযরত খলীফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.) ৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৫ পর্যন্ত নামায কায়েম করা সম্পর্কিত খুতবা প্রদান করেন এবং নির্দেশ দেন যে, অঙ্গসংগঠনগুলো প্রতি মাসে তাদের আমেলা সভার একটি বৈঠক কিয়ামে নামাযের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য আয়োজন করবে।

১৯৮৮ সালে, মুবাহালার চ্যালেঞ্জের পর ১৭ জুন ১৯৮৮ তারিখে হুযূর একটি রোইয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে কিয়ামে ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দুই বছর পরে, ১৯৯০ সালে, হুযূর সূরা ফাতিহার আলোকে দীর্ঘ খুতবার একটি ধারাবাহিক শুরু করেন, যা পরে "যওকে ইবাদত ও আদাবে দোআ' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শিশুদের উর্দু ক্লাসেও হুযূর নামায শিক্ষার অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সহজ পাঠ শুরু করেন এবং বড়দেরও তা থেকে উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দেন।

(জুমআর খুতবা, ১৭ অক্টোবর ১৯৯৭)

এক জুমআর খুতবায় 'সালাতুল উস্তা'-র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ব্যস্ততার মাঝে পড়া নামাযসমূহ এবং ফজরের নামায সংরক্ষণের প্রতিও জামাআতকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জুমআর নামায পড়ার প্রতি তাগিদ

১ জানুয়ারি ১৯৮৮তারিখে হুযূর ইউরোপীয় দেশসমূহে বসবাসরত আহমদীদের বিশেষভাবে জুমআর নামায পড়ার প্রতি তাগিদ দেন, যদিও চাকরি থেকে ছুটি নিতে হয় বা পদত্যাগ করতে হয়।

আরেক উপলক্ষে হুযূর বলেন, প্রতি তৃতীয় জুমআ যে কোনো মূল্যে আদায় করা উচিত।

সেই অনুযায়ী বহু মানুষ চাকরি বিসর্জন দিয়েও এই তাগিদে সাড়া দেয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন।

এভাবেই রোযা, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কে তাঁর নির্দেশনা ও উপদেশাবলী দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন খিলাফতে আহমদিয়ার ইবাদতের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ দিতে থাকবে এবং আহমদীদের তা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে।

মসজিদ নির্মাণ: পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে বিরোধীরা আহমদিয়া মসজিদ ধ্বংসের অভিযান শুরু করে। পাকিস্তানে খিলাফতে রাবিয়ার সময় প্রায় ২০টি মসজিদ শহীদ করা হয়।

সেই অনুযায়ী খিলাফতে রাবিয়ার যুগে আল্লাহ তাআলা জামাআতকে ১৩,০৬৫টি নতুন মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেন। এছাড়াও হাজারো মসজিদ ছিল, যা তাদের মুসল্লীদেরসহ জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হুযূরের মসজিদ সম্প্রসারণ আন্দোলনের অধীনে শত শত মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং সম্প্রসারণ করা হয়।

আমেরিকা ও কানাডা ছাড়াও ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে বহু মসজিদ নির্মিত হয়।

একশত (১০০) মসজিদ স্কীম: ১৯৮৯ সালে হুযূর জার্মানিতে ১০০টি মসজিদ নির্মাণের জন্য তহরীক করেন। ২২ মে ১৯৯৭ তারিখে হযরত সাইয়্যেদা মেহর আপা, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সহধর্মিণী, ইন্তেকাল করেন। ২৩ মে, খুদ্দামুল আহমদিয়া জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় ভাষণ প্রদানকালে হুযূর ঘোষণা করেন যে, হযরত মেহর আপার পক্ষ থেকে জার্মানির ১০০ মসজিদ স্কীমে ৩ লক্ষ জার্মান মার্ক (পরে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ করা হয়) প্রদান করা হবে। এছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৫০ হাজার মার্ক (পরে বাড়িয়ে দেড় লক্ষ মার্ক করা হয়) দেওয়ার ঘোষণা করেন। সেই অনুযায়ী, এই স্কীমের অধীনে ২৫ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে প্রথম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ৯ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে হুযূর তা উদ্বোধন করেন।

পরবর্তীতে হুযূর আফ্রিকার কয়েকটি দেশকেও অনুরূপ একশত মসজিদ নির্মাণের স্কীম প্রদান করেন। বহু দেশে এই প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এই স্কীমের অধীনে খিলাফতে রাবিয়ার সময়ে কেনিয়ায় ৭০টি মসজিদ এবং তানযানিয়ায় ৩৩টিরও বেশি মসজিদ নির্মিত হয়। এমন বহু দেশও ছিল যেখানে প্রথমবারের মতো মসজিদ নির্মাণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, তুভালু দ্বীপপুঞ্জের প্রথম মসজিদ ১৯৯২ সালে সম্পন্ন হয়।

বাইতুল ফুতুহ মসজিদ

ব্রিটেনে নতুন ও প্রশস্ত মসজিদের জন্য হুযূর ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে ৫ মিলিয়ন পাউন্ডের তহরীক করেন। ২৮ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে হুযূর বাইতুল ফুতুহের প্রস্তাবিত স্থানে ঈদুল আযহার নামায পড়ান এবং একই বছরের ১৯ অক্টোবর তিনি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখে হুযূর এই মসজিদের জন্য আরও ৫ মিলিয়ন পাউন্ডের তহরীক করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম (আবা) ৩ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে এর উদ্বোধন করেন। এতে এক সময়ে দশ হাজার মুসল্লি নামায আদায় করতে পারেন এবং এটি পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ।

ওয়াশিংটনে আহমদিয়া মসজিদের তহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.) আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে ৭ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে প্রদত্ত জুমআর খুতবায় জামাআতের সদস্যদের ওয়াশিংটনে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণের তহরীক করেন। (আল-ফযল, ১৯ আগস্ট ১৯৮৯) আল্লাহর কৃপায় বর্তমানে বাইতুর রহমান নামে একটি সুন্দর মসজিদ মেরিল্যান্ডে নির্মিত হয়েছে, যা জামাআতে আহমদিয়া আমেরিকার কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উত্তর মেরু অঞ্চলের প্রথম মসজিদ

৮ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখের জুমআর খুতবায় হুযূর বলেন:

"আমি নরওয়ের জামাআত আহমদিয়া সম্পর্কে বলতে চাই যে, তারা নর্থ কেপে একটি মসজিদ নির্মাণের অঙ্গীকার করেছে... আমার সঙ্গে থাকা কাফেলা এক হাজার পাউন্ড দেওয়ার ওয়াদা করেছে। আমি নিজে আগে থেকেই এক হাজার দিয়েছিলাম এবং খুতবার ফলস্বরূপ লোকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গীকার করেছে অথবা অর্থ প্রদান করেছে। সাধারণ তহরীকের পর মসজিদের কাজ শুরু হয়ে যাবে।"

(বদর কাদিয়ান, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৩)

কানাডার মিসিসাগা মসজিদের জন্য আর্থিক তহরীক

৩০ অক্টোবর ১৯৯২ তারিখে প্রদত্ত জুমআর খুতবায় হুযূর কানাডার মিসিসাগা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার তহরীক করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ১২ হাজার ডলার দেওয়ার ঘোষণা করেন। (আল-ফযল, ১ নভেম্বর ১৯৯২) মিসিসাগায় ৫ একর জমির উপর ২৮ হাজার বর্গফুট নির্মিত একটি ভবন কয়েক বছর আগে ক্রয় করা হয়েছিল এবং সেখানে মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রশস্ত ভবনে জামিয়া আহমদিয়া কানাডাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেলজিয়ামের মসজিদ

৩ মে ১৯৯৮ তারিখে বেলজিয়ামের জালসা সালানার সমাপনী ভাষণে হুযূর বেলজিয়ামে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণের তহরীক করেন। (আল-ফযল, ২৮ মে ১৯৯৮)

চলে চলো - তোমার পথ চেয়ে আছে মসজিদসমূহ,

তারা অপেক্ষমাণ, যেন আবার খোদার ঘর থেকে আজান ধ্বনি উঠে।

খিলাফতে খামিসার বরকতময় যুগ ও ইবাদতে ইলাহীর প্রতিষ্ঠা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্জা মাসরূর আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম (আবা), ইবাদত ও খিলাফতের গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন:

"সবসময় মনে রাখবেন যে, খিলাফতের সঙ্গে ইবাদতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর ইবাদত কী? তা হলো নামায। যেখানে মুমিনদের জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি এবং খিলাফতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেখানে পরবর্তী আয়াতে **আকীমুস সালাহ** (সূরা নূর: ৫৭)-এরও নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং স্থায়িত্ব লাভ করা এবং খিলাফতের ব্যবস্থার ফযল লাভ করার প্রথম শর্ত হলো নামায কায়েম করা। কারণ ইবাদত তো নামাযই। এটিই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ আকর্ষণ করবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার এই নিয়ামত দানের পর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে আমার ইবাদতের দিকে মনোযোগ না দাও, তবে তোমরা অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন তা কৃতজ্ঞতা হবে না, বরং অকৃতজ্ঞতা হবে। আর অবাধ্যদের জন্য খিলাফতের ওয়াদা নয়, বরং মুমিনদের জন্য। অতএব, এটি প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য সতর্কবার্তা, যে নিজের নামাযের প্রতি মনোযোগ দেয় না-যে খিলাফতের ব্যবস্থার ফযল তোমাদের কাছে পৌঁছাবে না। যদি খিলাফতের ব্যবস্থার ফযল পেতে চাও, তবে আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ মান্য করো: ইয়া'বুদূনানী (সূরা নূর: ৫৬), অর্থাৎ আমার ইবাদত করো। এর উপর আমল করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক

আহমদির উচিত এ কথা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে নেওয়া যে, আমরা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামত, যা খিলাফতের রূপে অব্যাহত রয়েছে, তখনই লাভ করতে পারব যখন আমরা নিজেদের নামাযসমূহ রক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

(খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১)

কিয়ামে নামাযের নির্দেশনা

হুযূর বলেন:

"সুতরাং উপ-সংগঠনসমূহ এবং জামাআতের নিজাম উভয়ই নিজেদের কাজ, বিশেষত সেই কাজ যা আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, এমনভাবে পরিকল্পনা করুক এবং এমন কর্মসূচি গ্রহণ করুক যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অলসতা ও দুর্বলতা নয়, বরং প্রতিদিন অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। আমাদের ইবাদতের উন্নতিই আমাদের সফলতা দান করবে। অতএব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরো নিজামের এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। লাজনা ইমাঈল্লাহকেও এ বিষয়ে নিজেদের ভূমিকা পালন করা উচিত।"

ঘরে শিশুদের নামাজের তদারকি করা, তাদের নিয়মিত নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং পুরুষ ও যুবকদের মসজিদে যাওয়ার জন্য অবিরত মনে করিয়ে দেওয়া-এটি নারীদের দায়িত্ব। যদি নারীরা নিজেদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেন, তবে এর মাধ্যমে এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে।" (জুমার খুতবা, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭)

এছাড়াও, ইজতেমা মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত ২০২৫ উপলক্ষে প্রেরিত তাঁর আত্মিক প্রেরণাদায়ক বার্তায় তিনি বলেন:

সুতরাং আনসারুল্লাহর এটি এক বিরাট দায়িত্ব যে, তারা এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং ইকামাতুস সালাত (নামাজ কায়েম করা)-এর হক আদায়কারী হবে। তারা নিজেদের সন্তানদের, নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নামাজের প্রতি মনোযোগী করবে। যদি সকল আনসার এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়, তবে এক বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। অতএব এদিকে মনোযোগ দেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। (মাসিক আনসারুল্লাহ ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে উদ্ধৃত)

ফজরের নামাজ ও ইন্টারনেট

হুযূর বলেন: অধিকাংশ ঘরের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। বড় থেকে ছোট পর্যন্ত অনেকে ফজরের নামাজ সময়মতো পড়ে না, কারণ তারা রাতে দেরি পর্যন্ত হয় টিভি দেখে অথবা ইন্টারনেটে বসে নিজেদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখে। ফলস্বরূপ সকালে ঘুম ভাঙে না। বরং এ ধরনের লোকদের এ চিন্তাই থাকে না যে সকালে নামাজের জন্য উঠতে হবে।

(জুমার খুতবা, ২০ মে ২০১৬)

যে সৌন্দর্যের তুমি খোঁজে আছো, তা নামাজই,

হুযূর আমাদের বলেছেন-জীবন নিজেই নামাজ!

রমযানুল মোবারক

অনুরূপভাবে, রমযান সম্পর্কেও বহু খুতবায় তিনি এর গুরুত্ব ও আদবসমূহ সামনে রেখে কীভাবে রমযান অতিবাহিত করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বছরে অন্তত চল্লিশটি নফল রোজা রাখা

হুযূর-এ-পুর নূর এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, বছরে অন্তত চল্লিশটি নফল রোজা রাখা উচিত। তিনি বলেন:

অন্তত এখন আমাদের উচিত চল্লিশটি রোজা সাপ্তাহিকভাবে রাখা। অর্থাৎ চল্লিশ সপ্তাহ বিশেষভাবে রোজা রাখো, দোয়া করো, নফল আদায় করো এবং সদকা দাও। (জুমার খুতবা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

যাকাত আদায়

হুযূর-এ-আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী হোন) বলেন:

"যাকাত আদায় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠে থাকে। এটি একটি মৌলিক বিধান। যাদের উপর যাকাত ফরজ, তাদের অবশ্যই তা আদায় করা উচিত এবং এতে যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে। কিছু লোকের অর্থ বহু বছর ব্যাংকে জমা পড়ে থাকে, এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি সেই অর্থ জমা থাকে, তবে তার উপরও যাকাত দিতে হবে। আবার নারীদের অলংকার রয়েছে, সেগুলোর উপরও যাকাত দিতে হবে। নির্ধারিত ন্যূনতম হারের ভিত্তিতে ঐ অলংকারের উপর যাকাত হবে। আবার কিছু জমির মালিকদের উপরও যাকাত ফরজ হয়, তাদেরও নিজেদের যাকাত আদায় করা উচিত। সুতরাং এটি একটি মৌলিক নির্দেশ, এ বিষয়ে অবশ্যই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।" (জুমার খুতবা, ৩১ মার্চ ২০০৬)

এছাড়াও, ইবাদত সম্পর্কিত বহু বিষয় তিনি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। এখনও ইবাদত কায়েমের এই বরকতময় ধারা অব্যাহত রয়েছে।

হুযূর (আল্লাহ তাঁকে শক্তিশালী করুন) বলেন: সুতরাং একজন আহমদির সর্বদা আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলীর উপর চলার চেষ্টা করা উচিত। তার উচিত নিজের জীবনকে ইবাদতে পরিপূর্ণ করা এবং সর্বদা আল্লাহ তাআলার সামনে ইস্তিগফার করতে করতে তাঁর আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করা, যাতে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে আমরা সকল প্রকার হক আদায় করার শক্তি লাভ করি। অতএব একজন মুত্তাকি ব্যক্তি হলো সুসংগঠিত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, যে সর্বদা এ চেষ্টায় থাকে যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলীর উপর আমল করতে হবে।

(জুমার খুতবা, ১৪ এপ্রিল ২০০৬)

আজ হযরত মুসলেহে মওউদ (রা.)-এর বরকতময় পরিকল্পনা অনুযায়ী, খিলাফতে আহমদিয়ার ছায়াতলে সারা বিশ্বের ১৬,০০০-এর অধিক আহমদিয়া মসজিদের গম্বুজ থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এটি যেমন আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তেমনি এ সত্যেরও ঘোষণা দিচ্ছে যে, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের উপর কখনো সূর্য অস্ত যাবে না।

সংক্ষেপে, খিলাফত সর্বদা ইবাদতের নিদর্শনসমূহের রক্ষক এবং আল্লাহর দ্বীনের পতাকাবাহী ছিল, আর এটিই তার সর্বাধিক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। খিলাফতে আহমদিয়ার প্রতিটি যুগ পবিত্র আয়াতের এক জীবন্ত ও দীপ্তিময় তাফসির হয়ে সামনে এসেছে: يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

২য় পাতার পর.....

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত পত্রিকার আদলে সারা বিশ্বে জামাতি সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের ধারাও শুরু হয় এবং বর্তমানে বহু দেশে বিভিন্ন ভাষায় এইসব প্রকাশনা বের হচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ("তোমার স্থান প্রসারিত কর) এই ওহী লাভ করেন, এরপর আল্লাহর ঘর তথা মসজিদ নির্মাণ এবং দরিদ্রদের জন্য ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়। আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং শত শত দরিদ্রের জন্য ঘর তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও, খিলাফতে আহমদিয়ার মাধ্যমে মানবসেবার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য স্কুল খোলা হয়েছে-এগুলোও খিলাফতের মিষ্টি ফলের অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি, 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অভাবগ্রস্তদের সেবা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি খিলাফতে আহমদিয়া জামাতের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, আল্লাহর জিকির, অনুবাদসহ নামাজ আদায়, ধর্মীয় পাঠ ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা, দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ-সবই খিলাফতের দিকনির্দেশনায় চলমান। এর চেয়েও বড় বিষয় হলো প্রতিটি আহমদির সাথে সময়ের খলিফার ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

সবশেষে, সেই অনন্য ঐক্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা বর্তমানে খিলাফতের প্রতিষ্ঠান অধীনে কেবল জামাতে আহমদিয়ার মধ্যেই বিদ্যমান। তা হলো হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায়ক হোন)-এর জুমার খুতবা, যা হেদায়েত ও নূরের এক মিনার। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের জামাত একই সময়ে একত্রিত হয়-শুধু ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধই হয় না, বরং ব্যাপক আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক উপকারও লাভ করে।

আজ খিলাফতে আহমদিয়া সমগ্র বিশ্বকে এই বৈশ্বিক ঐক্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এটি মানবজাতিকে আহ্বান করছে পারস্পরিক মতভেদ ভুলে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে এবং তাদের অন্তরে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করছে যে এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই বিশ্বশান্তির প্রকৃত উপায়। হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায়ক হোন) দিন-রাত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও তাদের নেতাদের এই সত্যিকারের শান্তির দিকে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ করুন, খিলাফতে আহমদিয়ার এই জীবনদায়ী আহ্বান দ্রুতই বিশ্বের হৃদয়ে প্রভাব ফেলুক, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এবং সকল সফলতা আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

"তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।"

আহমদিয়তের ইতিহাস অসংখ্য ঈমান-উদ্দীপক ঘটনার দ্বারা সুশোভিত, যা প্রমাণ করে যে খিলাফতে আহমদিয়ার সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার ছিল প্রতিটি যুগে বিশুদ্ধ তাওহীদের প্রচার এবং আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান।

আজও বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আযানের এ ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে:

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ নামাজের দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো।

এটি এক সর্বজনীন আহ্বান, যা প্রতিটি হৃদয়কে ডাকছে:

ভালোবাসার খোলা বাহু তোমাকে ডাকছে,

এসে যাও না, আল্লাহর দোহাই, এ ভালোবাসা একবার অনুভব করে দেখো।

আমরা, খিলাফতে আহমদিয়ার পদধূলির ন্যায় নগণ্যজন, প্রতিক্ষণ এ কামনা ও দোয়া করি:

শয়তানের শাসন মুছে যাক এ জগৎ হতে,

সমস্ত বিশ্বের শাসক হোন আমার মুস্তফা (সা.)।

যুবকদের দায়িত্বাবলী

বশীরুদ্দীন কাদির, মুরুব্বী সিলসিলা,

খিলাফতে আহমদিয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের জন্য এক মহান আধ্যাত্মিক নিয়ামত। এটি সেই বরকতময় ব্যবস্থা, যা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ওফাতের পর জামাতের হেদায়েত, সুরক্ষা এবং উন্নতির মাধ্যম হয়েছে। খিলাফত প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সত্য নেতৃত্বব্যবস্থার ধারাবাহিকতা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ঐক্য, দৃঢ়তা এবং আত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যেও খলিফা বানিয়েছিলেন।" (সূরা আন-নূর: ৫৬)

এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, খিলাফত হলো আল্লাহ তাআলার প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থা, যা ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ দান করা হয়। আহমদিয়া মুসলিম জামাতে এই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর পর খিলাফতে আহমদিয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

এই বরকতময় ব্যবস্থার ছায়াতলে যুবকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যুবকরাই যেকোনো জাতি বা জামাতের ভবিষ্যৎ। যদি যুবকরা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তবে জামাত উন্নতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়।

খিলাফতের আনুগত্য

যুবকদের সর্বপ্রথম ও মৌলিক দায়িত্ব হলো খিলাফতের আনুগত্য করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশালী তাদেরও আনুগত্য করো।"

(সূরা আন-নিসা: ৬০)

এই আয়াতে মুসলমানদের স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের ধর্মীয় নেতৃত্বের আনুগত্য করে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতে যুগের খলিফা আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের সাথে জামাতকে পরিচালিত করেন। সুতরাং আহমদিয়া যুবকদের উচিত খলিফায়ে ওয়াক্তের সঙ্গে ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর নির্দেশনাকে নিজেদের জীবনের অংশ বানানো।

ইসলাম ও আহমদিয়তের তাবলিগ

যুবকদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো ইসলাম ও আহমদিয়তের বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াতই হয়।"

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস ৩৪৬১)

এই হাদিস এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর দ্বীনের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। বর্তমান যুগে, যখন বিশ্ব আত্মিক অস্থিরতা ও নৈতিক সংকটে ভুগছে, তখন আহমদিয়া যুবকদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় যে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করবে।

যুবকদের উচিত নিজেদের নৈতিকতা, চরিত্র, জ্ঞান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে ইসলামের একটি বাস্তব নমুনা পেশ করা, যাতে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য দেখতে পারে।

ইবাদত ও আত্মিক উন্নতি

খিলাফতে আহমদিয়ার প্রকৃত কল্যাণ তখনই লাভ করা যায়, যখন মানুষ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"স্মরণ রেখো! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"

(সূরা আর-রাদ: ২৯)

যুবকদের উচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করা, নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা, এবং দোয়া ও ইস্তিগফারকে নিজেদের জীবনের অংশ বানানো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।"

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস ৬৪৬৪ বা ৬৪৬৫)

এই শিক্ষা আমাদের জানায় যে, ইবাদতে ধারাবাহিকতা ও আন্তরিকতাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তম নৈতিকতা ও পবিত্র চরিত্র

ইসলামে নৈতিকতার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন:

"আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কেবল উত্তম নৈতিকতার পূর্ণতা সাধনের জন্য।"

(মুসনাদ আহমদ, হাদিস ১৫৫৪০)

অতএব আহমদিয়া যুবকদের উচিত নিজেদের জীবনে সত্যবাদিতা, সততা, নম্রতা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং উত্তম আচরণ গ্রহণ করা।

জামাতি সেবা ও মানবতার খেদমত

ইসলাম মানবতার সেবাকে অত্যন্ত বড় নেক কাজ হিসেবে গণ্য করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর।"

(সূরা আল-মায়িদাহ: ৩)

এই আয়াত থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের উচিত নেক কাজগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। আহমদী যুবকদের উচিত জামাতি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া, দ্বীনি কার্যক্রমে সহযোগিতা করা এবং মানবসেবামূলক প্রকল্পে যুক্ত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে, মানবতার সেবা ইসলামের প্রাণ, আর এটিই প্রকৃত তাবলীগও বটে।

খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্ক

যুবকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হলো খিলাফতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। খলিফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শোনা, তাঁর নির্দেশনার ওপর আমল করা এবং তাঁর জন্য দোয়া করা একজন মুমিনের দায়িত্ব।

এক উপলক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, আমাদের জামাতে সেই ব্যক্তিই প্রকৃতভাবে প্রবেশ করে, যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজের সাধ্য ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী তার ওপর আমল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু নামমাত্র যুক্ত হয় অথচ শিক্ষার অনুসরণ করে না, সে যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ তাআলা এই জামাতকে একটি বিশেষ জামাত বানানোর ইচ্ছা করেছেন। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কেবল নাম লেখানোর মাধ্যমে জামাতে থাকতে পারে না। অর্থাৎ, যদি কারও ব্যবহারিক অবস্থা এই শিক্ষার অনুরূপ না হয়, তবে শুধু নাম অন্তর্ভুক্ত করানো দ্বারা সে প্রকৃত জামাতভুক্ত হতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জামাতে নেই। তিনি উপদেশ দেন:

"অতএব যতদূর সম্ভব, তোমাদের আমলকে সেই শিক্ষার অধীন কর যা তোমাদের দেওয়া হয়।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন: "হে মুসলমানগণ! তোমরা আনুগত্য ও বাধ্যতার সব পথ অবলম্বন কর এবং কোনো নির্দেশই পরিত্যাগ করো না। এর অর্থ হলো, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম গ্রহণ করো, যেন ইসলামের এমন কোনো নির্দেশ না থাকে যার ওপর তোমরা আমল করো না। এটাই সেই কুরবানি, যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিনের নিকট চান-মানুষ যেন নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও বাসনাকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে। যদি তোমরা মুক্তি লাভ করতে চাও, তবে তার উপায় হলো প্রথমে নিজের ভেতর থেকে সব ধরনের মুনাফিকি ও অসততা দূর করার চেষ্টা করা এবং জাতির প্রতিটি সদস্যকে ঈমান ও আনুগত্যের দৃঢ় শিলার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়ত, কেবল কয়েকটি হুকুমের ওপর আমল করে সন্তুষ্ট হয়ো না; বরং আল্লাহ তাআলার সব নির্দেশ পালন করো এবং তাঁর গুণাবলীর পূর্ণ প্রতিফলন হওয়ার চেষ্টা করো।"

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫৬-৪৫৭)

আহমদিয়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"এই যুগও একটি রূহানী যুদ্ধের যুগ। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। শয়তান তার সব অস্ত্র ও চক্রান্ত নিয়ে ইসলামের দুর্গের ওপর আক্রমণ করছে এবং সে চায় ইসলামকে পরাজিত করতে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই সময়ে এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে শয়তানের শেষ যুদ্ধে তাকে চিরদিনের জন্য পরাজিত করা যায়।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬, নতুন সংস্করণ, রাবওয়া)

তিনি আরও বলেন: "ধন্য সে ব্যক্তি, যে একে চিনতে পারে।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬, নতুন সংস্করণ, রাবওয়া)

বক্তব্যের সারমর্ম

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খিলাফতে আহমদিয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক মহান রূহানী নেয়ামত এবং এটি এমন এক ব্যবস্থা, যা জামাতের স্থায়িত্ব ও উন্নতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই বরকতময় ব্যবস্থার ছায়াতলে যুবকদের ভূমিকা অত্যন্ত মৌলিক ও নির্ধারক।

যদি আহমদী যুবকরা আন্তরিকতার সঙ্গে খিলাফতের আনুগত্যকে নিজেদের জীবনের অংশ বানায়, ইবাদতে নিয়মিততা অবলম্বন করে, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে এবং ইসলাম প্রচার ও মানবসেবার ময়দানে সক্রিয় থাকে, তবে তারা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনই সুন্দর করতে পারবে না, বরং জামাতে আহমদিয়াকে উন্নতির নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবে।

খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য এবং বাস্তব সম্পর্কই প্রকৃতপক্ষে সফলতার চাবিকাঠি। এই সম্পর্ক মানুষকে রূহানী শক্তি, চিন্তার দৃঢ়তা এবং দ্বীনি গায়রত দান করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খোলাফায়ে আহমদিয়তের শিক্ষায় এ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, শুধু নামমাত্র সম্পর্ক যথেষ্ট নয়; বরং এই শিক্ষাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ জীবনে জরুরি।

অতএব, প্রত্যেক আহমদী যুবকের উচিত এই অঙ্গীকার করা যে, সে নিজের সব যোগ্যতাকে দ্বীন ইসলাম-এর খেদমত, খিলাফতের শক্তিবৃদ্ধি এবং মানবকল্যাণের জন্য উৎসর্গ করবে। যখন যুবকরা এই প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হবে, তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাদের সঙ্গী হবে এবং জামাতে আহমদিয়া বিশ্বে শান্তি, ভালোবাসা ও হেদায়েতের উজ্জ্বল মিনার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

****

খিলাফতে আহমদীয়াত এবং ইসলামের বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বিজয়

শেখ মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, কাদিয়ান।

ইসলামের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয় খিলাফতে আহমদিয়্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক, খাতামুন নবিয়্যীন হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) সমগ্র মানবজাতির হেদায়েত ও নেতৃত্বের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-জুমুআহে তাঁর আগমনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَیُزَکِّیۡهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَةَ ۟ وَاِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ-(الجمعة:3)

অনুবাদ: তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে তাঁর নিদর্শনাবলী তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেন, যদিও এর আগে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী, মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য শুধু একটি পরিপূর্ণ শরীয়তই প্রদান করেননি, বরং একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবনও উপহার দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর বিধান হলো:

'কুল্লু নাফসিন জায়েকাতুল মাওত'

অর্থাৎ: প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

অতএব, নবীগণও মানব হিসেবে এই স্তর অতিক্রম করেন। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐশী বাণী পৌঁছে দিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রকৃত প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

সুতরাং তাঁদের কাজ পূর্ণ করা এবং তাঁদের যুগের বরকত দীর্ঘায়িত করার জন্য আল্লাহ তাআলা খিলাফতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীন আবু বাকার, উমর বিন খাত্তাব, উসমান বিন আফফান এবং আলি বিন আবি তালিব (রা.) পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর হেদায়েত ও নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা ইসলামের শিক্ষাকে অগ্রসর করেন, তার বিজয়ের উপায় সৃষ্টি করেন এবং উম্মাহকে নবুয়তের বরকত দ্বারা উপকৃত করতে থাকেন।

খিলাফতে আহমদিয়্যাও মহানবী (সা.)-এর বরকতময় খিলাফতে রাশেদারই একটি ধারাবাহিকতা ও শাখা। এর ভিত্তি আল্লাহ তাআলা নিজেই সূরা আল-জুমুআহে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন:

وَّاٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ○

(সূরা আল-জুমুআহ: ৪)

অনুবাদ: এবং তাদের মধ্য হতে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাঁকে প্রেরণ করবেন), যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াতে মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তাঁর ইন্তেকালের পর ২৭ মে ১৯০৮ সালে আহমদিয়া জামাতে খিলাফতের মাধ্যমে "দ্বিতীয় শক্তি-র প্রকাশ শুরু হয়।

অতএব, খিলাফতে আহমদিয়্যা বলতে সেই মহান স্বর্গীয় ব্যবস্থাকে বোঝায়, যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের (২৬ মে ১৯০৮) পর ২৭ মে ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেষ যুগে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয় খিলাফতে আহমদিয়্যার মাধ্যমেই নির্ধারিত, যা প্রকৃত ইসলামী আকীদার পতাকাবাহী এবং সত্য ইসলামের প্রতিনিধি। বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বরকতময় লেখনী থেকে দুটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি বলেন:

"দেখ, সেই সময় আসছে, বরং নিকটবর্তী, যখন আল্লাহ এই জামাতের জন্য পৃথিবীতে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা বিস্তার করবেন। এই জামাত পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়বে, এবং পৃথিবীতে ইসলাম বলতে এই জামাতকেই বোঝানো হবে। এসব মানুষের কথা নয়। এটা সেই আল্লাহর ওহী, যার সামনে কোনো কিছু অসম্ভব নয়।"

(তুহফা গোলড়ভিয়্যাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ১৮২)

আধ্যাত্মিক খিলাফতের দশ মহান উদ্দেশ্য এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয়

নবীদের পরে প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক খিলাফতের দশটি মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। বাস্তবতা হলো, এই উদ্দেশ্যগুলো কেবল খিলাফতের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এই দশটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

প্রথম: সাধারণভাবে শরীয়তের বাস্তবায়ন খিলাফতের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য। কারণ নবীর ইন্তেকালের পর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খলিফার উপর বর্তায়। এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দ্বিতীয়: মানুষের মধ্যে অধিকার ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। মুমিনদের মধ্যেও এমন বিরোধ হতে পারে। এসব মতবিরোধ শরীয়ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি হওয়া জরুরি; অন্যথায় বিবাদ ও বিভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য ইসলাম বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। কাজীগণ প্রকৃতপক্ষে খিলাফতের প্রতিনিধি, এবং তাঁদের উপর আবশ্যক যে তাঁরা সময়ের খলিফার ন্যায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। এ বিষয়ে ইসলাম নবীর ইন্তেকালের পর খলিফাকেই ধর্মীয় ব্যবস্থার সর্বশেষ বিচারক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। সুতরাং পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও খিলাফতের অস্তিত্ব অপরিহার্য।

তৃতীয়:খিলাফতের মাধ্যমে জামা'আতের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা হয় এবং পারস্পরিক মিলন, সম্প্রীতি ও একমতের ভিত্তি দৃঢ় করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির একজন এমন নেতা না থাকে, যার আনুগত্য করা আবশ্যক, ততক্ষণ তাদের সংগঠন ও ঐক্য সংরক্ষিত হতে পারে না।

চতুর্থ:খলিফা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও নবীর উত্তরসূরি হন। খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিকতার বিস্তার এবং নবীর বরকতের যুগকে দীর্ঘায়িত করা। খিলাফত এক অর্থে নবুয়তের প্রতিবিম্ব বা ধারাবাহিকতা। এ কারণেই মহানবী মহম্মদ (সা.) বলেছেন যে, প্রত্যেক নবুয়তের পর অবশ্যই খিলাফত আসে। (কানযুল উম্মাল)

পঞ্চম:খিলাফতের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো ধর্ম প্রচারের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা সংগঠিত করা এবং এর জন্য উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করা। এটি স্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের পথে সংগ্রামকারীদের আধ্যাত্মিক বাহিনীর একজন সেনাপতি না থাকে, ততক্ষণ তারা সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সংগ্রাম করতে পারে না। খলিফা ইসলাম প্রচারকারীদের সেনাপতি হন এবং তিনি যথাযথভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা কাজ গ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ:জামা'আতের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাও খিলাফতের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন একজন নবী তাঁর জামা'আতকে আত্মশুদ্ধি করান, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সব উপায় অবলম্বন করেন, তেমনিভাবে খলিফার দায়িত্ব হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সব ব্যবস্থা পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। বিশেষত ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার খলিফার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সপ্তম: ধর্মের শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা এবং তা মোকাবিলার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থা ব্যতীত মুমিনদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করা যায় না, আর শত্রুর অনিষ্টের যথাযথ মোকাবিলাও করা যায় না। এই কাজও কেবল সংগঠিতভাবে খিলাফতের মাধ্যমেই সম্ভব।

অষ্টম:আর্থিক ত্যাগের মাধ্যমে দ্বীনের সংগ্রামকে ধারাবাহিক রাখা যায়। এই ত্যাগ আত্মশুদ্ধির জন্যও অপরিহার্য। নিয়মিত আর্থিক ত্যাগের জন্য যে আত্মিক শক্তির প্রয়োজন, তা সৃষ্টি করা, জাগ্রত রাখা এবং ক্রমাগত উন্নত করা খিলাফতের দায়িত্ব। খিলাফত ছাড়া এই স্থায়ী ত্যাগের চেতনা বজায় রাখা যায় না।

নবম: নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং নিজের শক্তির প্রকাশ ঘটান। এই নিদর্শন প্রদর্শনই ধর্মের প্রাণ; এটি ছাড়া ধর্ম কেবল বাহ্যিক খোলস মাত্র। নবীদের পর আল্লাহ বিশেষভাবে খলিফাগণের মাধ্যমে এসব নিদর্শন প্রদর্শন করেন, যাতে বিরোধীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সত্য জামা'আতের জন্য প্রশান্তি ও ঈমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা হতে থাকে। নিঃসন্দেহে সব সত্য মুমিনই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে, কিন্তু খলিফা যেহেতু নবীর পূর্ণ উত্তরসূরি, তাই আল্লাহর এই শক্তির প্রকাশ তাঁর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয়। এটি খিলাফতের এক মহান আধ্যাত্মিক প্রয়োজন।

দশম: মুমিনদের জামা'আতের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রশিক্ষণ এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়ের জন্য সব বাহ্যিক উপকরণের পাশাপাশি ব্যথাভরা আন্তরিক দোয়াই সর্বোত্তম মাধ্যম। যেমন একজন আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর সন্তানদের জন্য দোয়া করেন, তেমনভাবে অন্য কেউ করতে পারে না। তাই নবীর পরে এমন আধ্যাত্মিক সত্তার গুরুত্ব ও প্রয়োজন স্পষ্ট, যারা দিনরাত হৃদয়ের গভীর বেদনা নিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক সন্তানদের জন্য আল্লাহর দরবারে নত হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিক বিজয়ের জন্য সময়ের খলিফার মহান দোয়াও অপরিহার্য।

খিলাফতে আহমদিয়্যার মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয়

আগে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, খিলাফত নবুয়তের পরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত হয়। একে নবুয়তের ছায়াও বলা হয়। একজন নবী তাঁর জীবদ্দশায় মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন, কিন্তু মানুষ হওয়ার কারণে তিনিও একদিন এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাআলা নবীর কাজকে পূর্ণতা দান করার জন্য খিলাফতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এজন্য খিলাফতকে নবুয়তের পূর্ণতা ও ধারাবাহিকতাও বলা হয়।

খিলাফত কেবল নবীর শুরু করা পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সম্পন্নই করে না, বরং যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী তা সম্প্রসারিতও করে।

১. খিলাফতের দায়িত্বসমূহ

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য আহমদিয়া জামা'আতে যে মহান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা উল্লেখ করার আগে সংক্ষেপে খিলাফতের দায়িত্বসমূহ কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করা সমীচীন মনে হয়।

খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য এত ব্যাপক ও বিশ্বজনীন যে, সকল ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন এর অন্তর্ভুক্ত। তবে এর সারাংশ এক বাক্যে বলা যায়:নবীর কাজসমূহ সংরক্ষণ করা, বজায় রাখা, সব বাহ্যিক বিকৃতি থেকে পবিত্র রাখা এবং এগিয়ে নেওয়া।

এই বাক্যকে এক শব্দে প্রকাশ করা যায়: ইকামাতে দ্বীন (ধর্ম প্রতিষ্ঠা)।

কিন্তু এই শব্দটিই এত ব্যাপক যে, এটি সকল ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সৎকাজের নির্দেশ, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা, জিহাদ, বিচারক নিয়োগ, শরীয়তী শাস্তি কার্যকর করা, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং ইসলামের প্রচার।

এখন এই মহান ব্যবস্থার বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য সময়ের খলিফার উপর ন্যস্ত করেছেন।

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মহান ব্যবস্থা

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য আহমদিয়া জামা'আত যে মহান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, তার কিছু ঝলক নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০৫ সালে জামা'আতে ওসিয়তের একটি ব্যবস্থা চালু করেন। এরপর সেই ব্যবস্থার অধীনে আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখার জন্য একটি প্রশাসনিক সংস্থা গঠন করা হয়, যার নাম ছিল আঞ্জুমান কারপরদাজান মাসালিহ বহিশ্‌তী মকবরাহ।

পরে কিছু সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯০৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যা' রাখা হয়। জামা'আতের বিস্তার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর কার্যপরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক, প্রশাসনিক, নৈতিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য পূরণের দায়িত্ব বর্তমান সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যার ওপর ন্যস্ত হয়, যা সময়ের খলিফার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়।

যখন তাবলীগী কাজের বিস্তার ঘটতে থাকে, তখন সেই কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত করা হয়।

সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যার বহু বিভাগ রয়েছে, যেগুলো নযারত নামে পরিচিত। প্রতিটি নযারত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে। প্রতিটি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে 'নাযির' বলা হয়, এবং সব নযারত সময়ের খলিফার নির্দেশনায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তেহরিকে জাদীদ

জামা'আতের তাবলীগ ও প্রকাশনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ২৩ নভেম্বর ১৯৩৪ সালে এই তেহরিক প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যোগ এখন যথারীতি একটি প্রতি ষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের প্রচার ও বলীগী কার্যক্রম বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে এবং অসংখ্য মানুষ সত্য ধর্মের ছায়াতলে প্রবেশ করছে।

তেহরিকে ওয়াক্‌েফ জাদীদ

এটি দ্বিতীয় খলিফার শেষ তেহরিক ছিল। এটি ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ আহমদীদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। দ্বিতীয় স্তরে এর লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসার।

এই আন্দোলনের ফলে গ্রামাঞ্চলের আহমদীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে।

তেহরিকে জাদীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসার

মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ইসলামের প্রচারকার্যকে দ্রুততর ও বিস্তৃত করার জন্য তেহরিকে জাদীদের বরকতময় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম আহমদিয়্যাতের প্রচার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।

প্রথম খিলাফতের শুরুতেই লন্ডনে ইসলামের প্রচারকার্য চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল এর মাধ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খিলাফতের সময় এই কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হতে থাকে।

১৯২৪ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) স্বয়ং লন্ডন সফর করেন। মসজিদ ফজল উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে ইউরোপ জুড়ে সংগঠিতভাবে ইসলামের প্রচার দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

১৯২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুফতি মহম্মদ সাদিক (রা.)-এর মাধ্যমে আহমদিয়্যাতের বার্তা সুসংগঠিতভাবে পৌঁছে যায়। বহু আমেরিকান, বিশেষত আফ্রিকান-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেন।

প্রায় ১৯২৪ সালের দিকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরব দেশসমূহে ইসলামের প্রচারের জন্য মুবাল্লিগ প্রেরণ শুরু করেছিলেন। এভাবে তেহরিকে জাদীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও আহমদিয়্যাতের প্রসার দ্রুততর হয়।

অঙ্গসংগঠনসমূহ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জামা'আতের মধ্যে কয়েকটি অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যা নিম্নলিখিত নামে সুপরিচিত:

১. লাজনা ইমাইল্লাহ্
২.নাসিরাতুল আহমদীয়া
৩.খুদ্দামুল আহমদীয়া
৪ আনসারুল্লাহ্
৫. আতফালুল আহমদীয়া

জামিয়া আহমদিয়্যা

আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, খিলাফতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সত্য ধর্মের তাবলীগ ও প্রচার। এই দায়িত্ব পালনের জন্য খিলাফতের বহু উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বিশেষভাবে দক্ষ মুবাল্লিগের প্রয়োজন হয়, যাতে এই কাজ উত্তমভাবে সম্পন্ন করা যায়।

মুবাল্লিগ প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের দ্বারা কাজ নেওয়ার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো জামিয়া আহমদীয়া।

এটি একটি মহান ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিরা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তাবলীগী কাজে-সংক্ষেপে প্রতিটি ক্ষেত্রে-মূল্যবান সেবা প্রদান করেন। এই প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত হাজারো ব্যক্তিকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রস্তুত করেছে।

তেহরিকে ওয়াক্‌েফ নও

এই তেহরিক ঘোষণা করেন হযরত মির্যা তাহির আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ৩ এপ্রিল ১৯৮৭ সালে জুমার খুতবার সময় বাইতুল ফজল মসজিদে।

হুযূর বলেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর তীব্র প্রয়োজন হবে। তাই জামা'আতের সদস্যদের উচিত তাদের সন্তানদের এই তেহরিকের অধীনে উৎসর্গ করা, যাতে ভবিষ্যতের প্রয়োজন পূরণ করা যায়।

এই ওয়াক্‌েফ নও সন্তানরা ভবিষ্যতে সত্য ধর্মের প্রচারে সক্রিয় হবে এবং অন্যান্য সেবাও সম্পন্ন করবে। আল্লাহর কৃপায় হাজারো শিশু ইতোমধ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে নযারতে ওয়াক্‌েফ নও নামে যথারীতি একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এম.টি.এ প্রতিষ্ঠা

Muslim Television Ahmadiyya আহমদিয়া জামা'আতের জন্য এক মহান নিয়ামত।

এম.টি.এ প্রকৃতপক্ষে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর সমষ্টি এবং অসংখ্য ঐশী অনুগ্রহ, দয়া ও পুরস্কারে পরিপূর্ণ এক মহান নিদর্শন।

ইসলামের প্রচার, শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য এম.টি.এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর মাধ্যম। প্রকাশনা বিভাগের অধীনে এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই দায়িত্ব পালন করছে।

এম.টি.এ এখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদিয়্যাতের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এটি আহমদী ছেলে-মেয়ে ও বয়স্কদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরও একটি অত্যন্ত উপকারী মাধ্যম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর খুতবা, ভাষণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান বহু হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ইন্টারনেট ওয়েবসাইট

Alislam.org আহমদিয়া মুসলিম জামা'আত ইউএসএ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

ইংরেজি ওয়েবসাইট ছাড়াও আরবি, চীনা ও ফরাসি ভাষায়ও ওয়েবসাইট রয়েছে। প্রায় ১৭০টি বই অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে তাফসিরে কবীর, তাফসিরে সগীর, হাকায়িকুল ফুরকান এবং ফাহমুল কুরআন উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন জামা'আতী সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং মির্যা তাহির আহমদ (রাহে.)-এর কুরআন অনুবাদ ক্লাসও ওয়েবসাইটে রয়েছে।

এটি আহমদিয়্যাত প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং অত্যন্ত সফলভাবে এই দায়িত্ব পালন করছে।

২. বিরোধ নিষ্পত্তি

খিলাফতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, যদি জামা'আতের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দাবিকে সামনে রেখে সেই বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

যদি পারস্পরিক বিরোধ স্বীকৃত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মীমাংসা করা হয়, তবে জামা'আতে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং এর সংহতি নষ্ট হয় না।

আল্লাহর কৃপায় আহমদিয়া জামা'আতে বিরোধ সুন্দরভাবে নিষ্পত্তির একটি চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। এর কিছু বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

স্থানীয় সভাপতি ও জেলা আমীর

প্রাথমিকভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার কাজ স্থানীয় সভাপতি বা জেলা আমীর সম্পন্ন করেন। যদি স্থানীয়ভাবে সমাধান সম্ভব না হয়, তবে বিষয়টি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগসমূহে যায়, যেখানে সমঝোতা ও সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

যদি সন্তোষজনক ফলাফল না আসে, তবে কাজা (বিচার) প্রতিষ্ঠান এসব বিরোধের সিদ্ধান্ত দেয়।

নযারতে উমূরে আম্মা

এই বিভাগ জামা'আতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করে।

এছাড়া সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির কাজও এটি করে। এই বিভাগ উভয় পক্ষকে বিরোধ মীমাংসায় সহায়তা করে এবং উভয় পক্ষ নিজেদের ইচ্ছায় এই বিভাগের পরামর্শে বিরোধ শেষ করতে পারে। যদি সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষ তাদের বিষয়টি কাজায় নিতে পারে।

সদর উমূমী

যদি কোনো বিষয় স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান না হয়, তবে তা সদর উমূমীর নিকট আসে। সদর উমূমীর নিযুক্ত ব্যক্তিরা উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেন।

যদি উভয় পক্ষ তা গ্রহণ করে, তবে বিষয়টি নিষ্পন্ন হয়; অন্যথায় তারা উমূরে আম্মা বা কাজায় যাওয়ার অধিকার রাখে।

দারুল ক্বাযা প্রতিষ্ঠা

উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল মীমাংসামূলক ও পরামর্শমূলক সংস্থা, এবং তারা এই কাজ আংশিকভাবে সম্পাদন করে। বিরোধ নিষ্পত্তির মূল প্রতিষ্ঠান হলো দারুল ক্বাযা।

আহমদিয়া জামা'আতে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে সৎ, অভিজ্ঞ এবং বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্বাযী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ করা হয়। যদি কেউ ক্বাযীর সিদ্ধান্ত মেনে না নেয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য দারুল ক্বাযার মধ্যে বোর্ড গঠন করা হয়। এরপর সর্বশেষ আপিল সময়ের খলিফার নিকট যায়, এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৪. শিক্ষার ব্যবস্থা

শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। সকল প্রকার উন্নতি-তা ধর্মীয় হোক বা জাগতিক-শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে, জামা'আতের ব্যবস্থা এমন সব পদ্ধতি ও উপায় গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রগতি করতে পারে।

নিম্নোক্ত অংশে খিলাফতে আহমদিয়্যার মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়ের জন্য পরিচালিত শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হলো।

নযারতে তালীম

সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যার অধীনে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, তাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, দিকনির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই বিভাগের ওপর ন্যস্ত।

এছাড়াও শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কৃতী আহমদী ছেলে-মেয়েদের বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানও এই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।

(ধ) স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা

সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যা জামা'আতের সদস্যদের শিক্ষাসুবিধা প্রদানের জন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

নযারতে তালীম এবং অঙ্গসংগঠনগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে।

(ন) জামা'আতের জন্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহমদিয়া জামা'আত তার সদস্যদের জাগতিক শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছে। এই কাজকে বিস্তৃত ও আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেহ ১৯৮০ সালে মজলিসে মুশাওয়ারাত উপলক্ষে জামা'আতের জন্য একটি মহান শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, যার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক ছেলে অন্তত ম্যাট্রিক পর্যন্ত এবং প্রত্যেক মেয়ে অন্তত মিডল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে।

২. কোনো শিশু পিছিয়ে থাকবে না; বরং প্রত্যেক শিশু যতদূর সম্ভব পড়াশোনা করবে। মেধাবী শিশুরা যদি পরিস্থিতির কারণে অগ্রসর হতে না পারে, তবে জামা'আত তাদের সহায়তা করবে-দোয়ার মাধ্যমেও এবং আর্থিকভাবেও। অতএব অঙ্গীকার করো যে, কারও পিছনে থাকবে না। আজ যদি আল্লাহ তোমাদের দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তোমাদেরও গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

৩. যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। শিশুদের যে বৃত্তি দেওয়া হবে, তাকে পুরস্কারভিত্তিক বৃত্তি বলা হবে না; বরং ছাত্রদের অধিকার পরিশোধ বলা উচিত। আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রত্যেক আহমদীকে তার বয়স অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এই দায়িত্ব খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহর ওপর ন্যস্ত। প্রত্যেক ঘরে তাফসিরে সগীর থাকা আবশ্যক। এছাড়া হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ব্যাখ্যাকৃত কুরআনের তাফসিরও অধ্যয়ন করা উচিত।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

দ্বিতীয়ত, কোনো শিশু যেন আর্থিক অসুবিধার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং মেধাবী ও যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন জামা'আত পূরণ করে।

পুরস্কারসমূহ

শতবার্ষিক আহমদিয়া শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অধীনে ঘোষণা করা হয় যে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদান করা হবে।

ম্যাট্রিক থেকে এম.এ./এম.এসসি পর্যন্ত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রী পাবে:

* এক ভুরি খাঁটি স্বর্ণের পদক
* তাফসিরে সগীর অথবা হুযূরের স্বাক্ষরিত পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রী পাবে:১২ আনা স্বর্ণের পদক, তাফসিরে সগীর অথবা হুযূরের স্বাক্ষরিত পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ।

তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রী পাবে: একটি রৌপ্য পদক, তাফসিরে সগীরঅথবা পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ

আর্থিক কুরবানি

আহমদিয়্যাতের খোলাফায়ে কেরামের প্রবর্তিত আর্থিক কুরবানির তেহরিকসমূহ সর্বদা জামা'আতের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক কুরবানির চেতনাকে জীবিত রেখেছে।

জামা'আতের সদস্যরা সর্বদা উৎসাহের সঙ্গে এসব কুরবানিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সময়ের খলিফা যা চেয়েছেন, তার চেয়েও বেশি কুরবানি পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় খলিফার যুগে তেহরিকে জাদীদ এবং ওয়াক্বেফ জাদীদ-এর অধীনে প্রদত্ত আর্থিক কুরবানিসমূহ আহমদিয়্যাতের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

এই তেহরিকগুলো এখন একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অধীনে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, এবং এসব বিভাগ বিভিন্ন উপায়ে সদস্যদের আর্থিক কুরবানির দিকে উৎসাহিত করে চলেছে।

জামা'আতে আর্থিক কুরবানির মান অনেক উঁচুতে উন্নীত হয়েছে, এবং এসব কুরবানির ফলে আজ ২১৬টি দেশে আহমদিয়্যাতের পতাকা উড়ছে, আর পবিত্র আত্মাগণ এসব কুরবানির ফলে প্রবাহিত মিষ্টি ঝর্ণাধারা থেকে তাদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করছে।

আর্থিক কুরবানি শুধু জামা'আতের উন্নতি ও অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমই নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধিরও একটি উপায়। আর্থিক কুরবানি ছাড়া আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায় না।

আর্থিক ও অন্যান্য কুরবানির চেতনা জাগ্রত করার নিয়মিত ব্যবস্থা

আহমদিয়া জামা'আতে আর্থিক ও অন্যান্য কুরবানি পেশ করার একটি নিয়মিত ব্যবস্থা রয়েছে। জামা'আতে চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত কাঠামো বিদ্যমান।

জামা'আতে স্থায়ী চাঁদার বিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

চাঁদা আম

এই চাঁদা প্রত্যেক উপার্জনকারী সদস্যের উপর বাধ্যতামূলক। এর হার প্রতি রুপিতে এক আনা, অর্থাৎ আয়ের ১/১৬ অংশ।

চাঁদা ওসিয়্যত

এই চাঁদা কেবল তাদের উপর বাধ্যতামূলক, যারা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ওসিয়্যতের ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হন।

এর হার আয়ের ১/১০ অংশ থেকে ১/৩ অংশ পর্যন্ত।

এছাড়া ওসিয়্যতকারী ব্যক্তিকে তার সম্পত্তির ১/১০ অংশ সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যার অনুকূলে ওসিয়্যত করতে হয়।

চাঁদা জালসা সালানা

এটি বার্ষিক সম্মেলনের জন্য চাঁদা। এর পরিমাণ এক মাসের আয়ের ১/১০ অংশ, এবং বছরে একবার প্রদান করতে হয়।

চাঁদা তেহরিকে জাদীদ

এই চাঁদা তেহরিকে জাদীদ-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এর মানক ওয়াদা হলোএক মাসের আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, আর সর্বনিম্ন বার্ষিক ওয়াদা ২৪ রুপি।

চাঁদা ওয়াক্ফে জাদীদ

১৯৮৫ সালের পূর্বে ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদার সর্বনিম্ন হার ছিল বার্ষিক বারো রুপি।

পরে ১৯৮০ সালে গরুধ ঞধযরৎ অযসধফ নির্ধারিত সর্বনিম্ন হার বাতিল করেন এবং সদস্যদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

অন্যান্য চাঁদা

উপরোক্তবাধ্যতামূলক চাঁদাগুলোর বাইরে, প্রতিটি অঙ্গসংগঠনের নিজস্ব পৃথক চাঁদাও রয়েছে।

এছাড়াও বিশেষ অনুষ্ঠান, সাময়িক প্রয়োজন, জরুরি অবস্থা ও আকস্মিক পরিস্থিতির জন্যও তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

এসব চাঁদার আদায় ও ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য বহু বিভাগ কাজ করে। এর মধ্যে নযারতে বায়তুল মাল আমদানি এবং নযারতে বায়তুল মাল ব্যয় উল্লেখযোগ্য।

চাঁদা সংগ্রহের কাজ জামা'আতের সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবামূলকভাবে সম্পাদন করেন।

খিলাফতের প্রয়োজন পূরণের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা

সংক্ষেপে, জামা'আতের সকল কাজ ও খিলাফতের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ জোগাতে জামা'আতে একটি স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বিদ্যমান।

উপরোক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আহমদিয়া জামা'আতের মধ্যে এমন এক মহান ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে খিলাফতের দায়িত্বসমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

এমন মহান ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে পাওয়া যায় না।

এই কাঠামোর মধ্যে খলিফা কেন্দ্রীয় অবস্থান অধিকার করেন। তাঁর ভূমিকা মানবদেহের হৃদয়ের ন্যায়। যেমন দেহে বিভিন্ন ব্যবস্থা কাজ করে এবং সবকিছু হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল, তেমনি জামা'আতের সকল ব্যবস্থাও খলিফার দিকনির্দেশনার উপর নির্ভরশীল।

যদি হৃদয় কোনো কারণে শরীরের কোনো অংশে যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ না করে, তবে সেই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে জামা'আতের সকল প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও অঙ্গসংগঠনকে সময়ের খলিফার নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সময়ের খলিফার আনুগত্যের মাধ্যমেই এসব ব্যবস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালনের শক্তি ও মর্যাদা লাভ করে।

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন সর্বদা আহমদিয়া জামা'আতের উপর খিলাফতের ছায়া বজায় রাখেন এবং আহমদিয়্যাতের অগ্রযাত্রার কাফেলা যেন নিজ গন্তব্যের দিকে চলমান থাকে। আমীন, সুম্মা আমীন।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় নির্ধারিত

এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় নির্ধারিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আহমদিয়া জামা'আতের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ অগ্রগতির চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মহিমান্বিত ভাষায় বলেছেন:

"হে সকল মানুষ! শুনে রাখো, এটি সেই সত্তার কসম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই জামা'আতকে সকল দেশে বিস্তার করবেন এবং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সকলের উপর বিজয় দান করবেন। সেই দিন আসছে, বরং নিকটবর্তী, যখন পৃথিবীতে শুধু এই এক ধর্মই সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হবে। আল্লাহ এই ধর্ম ও এই আন্দোলনে অসাধারণ ও অতুলনীয় বরকত দান করবেন। যে কেউ একে ধ্বংস করতে চাইবে, সে ব্যর্থ হবে। এই বিজয় কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে... পৃথিবীতে একটিই ধর্ম থাকবে এবং একটিই নেতা থাকবে। আমি তো কেবল একটি বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব আমার হাত দ্বারা সেই বীজ বপন করা হয়েছে, এখন তা বৃদ্ধি পাবে ও প্রস্ফুটিত হবে, এবং কেউই তাকে থামাতে পারবে না।" (তাজকিরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

এই যুগে আল্লাহ তাআলা মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ গোলামকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য প্রেরণ করেছেন এবং আমরা এ উদ্দেশ্যেই তাঁর বায়আত করেছি। অতএব, আমাদের সর্বান্তকরণে চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা এর হক আদায় করতে পারি এবং এ জন্য দোয়াও করা উচিত।

বিশেষ করে রমযানের এই অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমাদের এ দোয়া করা উচিত যে, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও এর গায়রাত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা যেন সবার অগ্রগামী হতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ তৌফীক দান করুন এবং আমাদের দুর্বলতাসমূহ দূর করে দিন।

গত জুমআতেও আমি মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়ার কথা বলেছিলাম- যেন তারাও প্রকৃত তাওহীদকে বুঝতে পারে এবং এর উপর আমল করতে পারে। তবেই তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে। তবেই তারা শত্রুদের দজ্জালী চক্রান্ত থেকে রক্ষা পেতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরও এ তৌফীক দান করুন।

আজ নামাযের পর আমি একজন মরহুমের গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াবো। তিনি হলেন মুকাররম জিকরুল্লাহ তাইয়্যু আয়্যুব সাহেব, যিনি জামা'আতের একজন মুরব্বী ছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

আল্লাহ তাআলার কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল নাইজেরিয়ার সঙ্গে। ১৯৬৫ সালে তিনি একটি রু'য়ার মাধ্যমে আহমদিয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঘানার মিশনারি ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ১৯৬৯ সালে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসেন। এক বছর সেবা করার পর ১৯৭০ সালে শাহিদ ডিগ্রির জন্য জামিয়া আহমদিয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। ১৯৭৭ সালে তিনি মাওলভী ফাযিল পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৯ সালে তিনি শাহিদ ডিগ্রি লাভ করেন।

এরপর তিনি নাইজেরিয়ায় ফিরে যান এবং সেবার কাজ শুরু করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রায় ৪৭ বছর সেবার তৌফীক লাভ করেন। নাইজেরিয়ার বিভিন্ন স্থানে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। নাইজেরিয়ায় নায়েবে আমীর হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি সাংবাদিকতায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন। এজন্য এ ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করেছেন। তিনি জামিয়াতুল মুবাশশিরীন নাইজেরিয়ার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন-প্রথমে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে, পরে তিন-চার বছর নিয়মিত প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি একজন অত্যন্ত ভালো খেলোয়াড়ও ছিলেন এবং খেলাধুলার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি কখনো খেলাধুলাকে তাঁর ইবাদতের পথে বাধা হতে দেননি। তিনি একজন ভালো লেখক, ভাষাবিদ এবং কবিও ছিলেন।

তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে আবদুল মুজীব সাহেব বর্তমানে নাইজেরিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে এবং জবারবা ড়ভ জবষরমরড়হং ঘরমবৎরধ-এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন ওয়াক্ফে জীবন।

মিশনারি ইনচার্জ তাহির আদনান সাহেব বলেন যে, মরহুম অত্যন্ত পরহেজগার, অনুগত এবং জামা'আতের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে এবং এ সময়ে তিনি তাঁর উচ্চ চরিত্র, বিনয়, নম্রতা, খেলাফত ও নিজাম-এ-জামা'আতের প্রতি অসাধারণ আনুগত্য ও বাধ্যতার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন।

তিনি বলেন, যখন তিনি মিশনারি ইনচার্জ হন, তখন মরহুম তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি পূর্ণ বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধ ও আনুগত্যের সঙ্গে তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং সেগুলোর উপর আমল করেছেন।

অনুরূপভাবে, মুরব্বী ইউসুফ খালিক সাহেব বলেন যে, প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি ছাত্রদের নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রতি অসাধারণ মনোযোগ দিতেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সর্বদা এ উপদেশ দিতেন যে, কোনো কাজের জন্য যেন অজুহাত পেশ না করা হয়। তিনি বিশেষভাবে খলীফাতুল মসীহের নির্দেশনার উপর তৎক্ষণাৎ আমল করার উপর জোর দিতেন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ছাত্রদের তাবলীগি অভিযানে পাঠাতেন। প্রত্যেক কাজে তিনি নিজস্ব বাস্তব উদাহরণ পেশ করতেন, যা ছাত্রদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

আমি নিজেও তাঁকে দেখেছি। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক, বিশ্বস্ত এবং অত্যন্ত বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি মাগফিরাত ও রহমের আচরণ করুন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন।

হযরত মসীহে আল খামিস (আ.)-এর অতুলনীয় শান্তি প্রচেষ্টা

লাঈক আহমদ নায়েক, মুরুব্বী সিলসিলা

আজ সমগ্র বিশ্ব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে: মানব সভ্যতা কীভাবে তার টিকে থাকা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারে?মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মৌলিক উপাদান "শান্তি"সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য, তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে অশান্তি, অনিরাপত্তা, অসামঞ্জস্য, অন্যায় এবং উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। অনেক মানুষ আবেগ ও অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে এবং ভোগবাদ, স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিস্বার্থে ডুবে গেছে। এবং এই রোগে শুধু একটি জাতি আক্রান্ত নয়; বরং বিশ্বের অধিকাংশ জাতিই এতে আক্রান্ত।গভীর উদ্বেগের বিষয় হলো, মানবতা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সংকটপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তবুও এটি তার অচেতনতার ঘুম থেকে জাগতে অস্বীকার করছে; বরং দিন দিন ধ্বংস, বিপর্যয় ও সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর এক চিরন্তন নিয়ম যে, মানবজাতির সংশোধনের জন্য এবং তাঁর বান্দাদের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি নবীদের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রেরণ করেন।

বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মানবতা সবসময় নবীদের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) আনা শিক্ষার মাধ্যমেই প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি লাভ করেছে।

এই শিক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক উপাদান হলো "ধর্মপরায়ণতা"(তাকওয়া) অর্জন।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-হোক তা পারিবারিক বা গৃহস্থালী, সামাজিক বা সামষ্টিক, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক-সংক্ষেপে, সর্বত্রই ধর্মপরায়ণতার অনুসরণ করলেই কেবল শান্তি অর্জন সম্ভব।

যদি একজন ব্যক্তি ধর্মপরায়ণতার সঠিক উপলব্ধি অর্জন করে, তবে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণাবলীর উপর আমল করতে পারে এবং সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হতে পারে।

নবীদের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) মধ্যে যিনি ধর্মপরায়ণতার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন, এর গুরুত্ব ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর সঠিক উপলব্ধি বিশ্বকে প্রদান করেছেন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী, নবীদের সীলমোহর, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তিনি শুধু নৈতিকতা ও গুণাবলীহীন মানবজাতিকে ধর্মপরায়ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর উপায় ও পদ্ধতি বর্ণনা করেননি, বরং নিজেই তা বাস্তবে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষের একটি পবিত্র সমাজ গড়ে তুলেছেন। এর পাশাপাশি, তিনি শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, যিনি সেই যুগে প্রেরিত হয়ে ধর্মকে পুনর্জীবিত করবেন।

অতএব, ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, সাইয়্যিদনা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর আবির্ভাব পবিত্র নবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমন হিসেবে সংঘটিত হয়েছে।

যেমন পবিত্র নবী (সা.) সমগ্র বিশ্বের সকল জাতির জন্য প্রতিশ্রুত, তেমনি তাঁর দ্বিতীয় আগমনও সকল জাতির জন্য হওয়া নির্ধারিত ছিল।

অতএব, সাইয়্যিদনা হযরত মসীহ মওউদ (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে এই দাবি করেন যে, তিনি সকল জাতির জন্য প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হিসেবে এসেছেন, যাতে সবাইকে এক ধর্মের অধীনে একত্রিত করা যায়।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর আগমনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

মানুষকে পারস্পরিক সমঝোতার দিকে আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থ পৈগাম-এ-সুলহ-এ বলেন:

"হে প্রিয়জন! শান্তির মতো আর কিছু নেই। আসো, আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে এক হয়ে যাই এবং এক জাতিতে পরিণত হই। তোমরা দেখছো, পারস্পরিক অস্বীকৃতির ফলে কত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশ কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন এটিও পরীক্ষা করে দেখো-পারস্পরিক স্বীকৃতির কত বরকত রয়েছে।"

(পৈগাম-এ-সুলহ, রুহানী খাজাইন, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৫৬)

যেমনটি বলা হয়েছে, এটাই সেই শেষ যুগ, যার সম্পর্কে পবিত্র নবী ? আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

বিশ্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভুলে গেছে।

তবুও, এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশে এই সমস্ত অকল্যাণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন এবং সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন।

তিনি হলেন হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর পঞ্চম খলিফা, সাইয়্যিদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম, আল্লাহ তাঁকে তাঁর শক্তিশালী সাহায্যে সমর্থন করুন।

আজ যখন বিশ্ব শান্তির জন্য আকুল এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মেঘ আকাশে ভাসছে, তখন এই শান্তির দূত বারবার বিশ্বকে শান্তির দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এই ভয়াবহ ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করছেন।

পঞ্চম খেলাফতের যুগ ২০০৩ সালে শুরু হয়, এবং হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা হন।

পঞ্চম খেলাফতের শুরু থেকেই, হুজুর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁকে সমর্থন করুন)-এর তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় বিশ্বশান্তির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

খলিফার খুতবা

হুজুর আনওয়ার খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন সময়ে তাঁর খুতবার মাধ্যমে বিশ্বের সম্মুখীন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং বিশেষভাবে জামাতের সদস্যদের ও সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করে বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি জামাতের সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ইসলামের শান্তি, সমঝোতা ও সম্প্রীতির সুন্দর ও মনোরম শিক্ষা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে।

তিনি এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য বারবার দোয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

এছাড়াও, তিনি মুসলিম উম্মাহ এবং বৃহৎ শক্তিগুলোকে সতর্ক করেছেন এবং এসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এই বক্তব্যগুলোতে তিনি কোনো একটি অঞ্চলের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং এশিয়ার দেশগুলোর সমস্যা, ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপদ, আফ্রিকার দেশগুলোর অস্থিরতা কিংবা আরব বিশ্বের শাসক শ্রেণির প্রতি অসন্তোষ-প্রতিটি অঞ্চলের সমস্যার কথা তিনি সময়ে সময়ে উল্লেখ করেছেন এবং বারবার নির্দেশনা দিয়েছেন যে কীভাবে সেখানে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

হুযূর (আবাঃ)-এর খিতাবসমূহ

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বড় বড় রাজা ও নেতাদের উদ্দেশে চিঠির মাধ্যমে সম্বোধন করা পঞ্চম খেলাফতের সাফল্যগুলোর একটি উজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক দিক। হুযূর (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং শান্তির প্রয়োজনীয়তা ও তা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ডেনমার্কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ক একটি ভাষণ দেন এবং সেই দেশগুলোতে ইসলামোফোবিয়া দূর করার প্রচেষ্টা চালান। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপকৃত হন। ২০০৭ সালে তিনি লন্ডনের রোহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশগত শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতা দেন। ২০০৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তিনি পবিত্র কুরআন থেকে সমকালীন বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান তুলে ধরেন। একই বছরে ভারতের কেরালায় তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন।

২০০৯ সালে গ্লাসগোতে এক ভাষণে তিনি এই নীতিমালা তুলে ধরেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শান্তির উপর নির্ভরশীল এবং শান্তি ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল। ২০১৩ সালে তিনি নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পার্লামেন্টে "বিশ্বশান্তি-সময়ের প্রয়োজন"শীর্ষক একটি ভাষণ দেন। ২০১৪ সালে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বলেন যে, আল্লাহর কৃপায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বিরোধীদের জুলুম ও নির্যাতন সত্ত্বেও, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ৬ অক্টোবর

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

২০১৫ সালে হুযূর ডাচ জাতীয় পার্লামেন্টে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি বিশ্বশান্তির পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান উপস্থাপন করেন।

২০১৬ সালে তিনি কানাডা সফর করেন, যেখানে বিভিন্ন স্থানে, কানাডার জাতীয় পার্লামেন্টসহ, তিনি ভাষণ প্রদান করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাজনা ইমায়িল্লাহ ইউকের ইজতেমায় তিনি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ভার্জিনিয়ায় বাইতুল মাসরূর মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ২০১৯ সালে তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ভাষণ দেন, যেখানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে শিক্ষা ও মানবসেবার উপর জোর দেন।

চিঠিপত্র

২০১২ সালে, বিশ্বের সামনে উপস্থিত বৈশ্বিক বিপদের প্রেক্ষাপটে, হুযূর (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বিশ্বনেতাদের উদ্দেশ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই চিঠিগুলো পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কানাডার প্রধানমন্ত্রী, সৌদি আরবের খ??ুল হারামাইন শরিফাইন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, জার্মানির চ্যান্সেলর, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাজ্যের রাণী, রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেই প্রমুখের কাছে পাঠানো হয়।

এরা বিশ্বের প্রধান শক্তিধর দেশসমূহের নেতৃত্বে আছেন, এবং যদি তারা চায়, তবে তারা বিশ্বকে একত্রিত করতে পারে এবং এতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই চিঠিগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে হুযূর অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে এসব নেতাদের বুঝিয়েছেন যে পৃথিবী আগুনের খাদটির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে; যদি তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে বিশ্ব একটি ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন হবে।

ন্যাশনাল পিস সিম্পোজিয়ামের প্রতিষ্ঠা

২০০৪ সালে হুযূর ন্যাশনাল পিস সিম্পোজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন মতবাদ ও পেশার মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সঙ্গে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় নিয়ে আলোচনা করা। এই পিস সিম্পোজিয়াম প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর কৃপায় হুযূর নিজে এতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর ভাষণের মাধ্যমে উপস্থিত অতিথিদের এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং সমসাময়িক বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেন।

পিস সিম্পোজিয়ামে হুযূর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সহনশীলতা, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পরিচয়, পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি, ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যায়ভিত্তিক সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

শান্তি পুরস্কার

একইভাবে, যারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের সেবাকে স্বীকৃতি দিতে ২০০৯ সালে হুযূর *আহমদিয়া মুসলিম প্রাইজ ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব পিস* নামে একটি পুরস্কার চালু করেন। এই পুরস্কার প্রতিবছর তাদের প্রদান করা হয় যারা নিজেদের ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন। প্রথম পুরস্কার মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য লর্ড এরিক অ্যাভেবুরি-কে প্রদান করা হয়। এরপর থেকে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে এবং বিভিন্ন পুরুষ ও নারীর, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মানিত করা হয়।

এছাড়াও, হুযূরের খেলাফতের বরকতময় সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক উদ্যোগ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে পিস প্যামফলেট বিতরণও একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

সংক্ষেপে, পঞ্চম খলিফা নিজে সরাসরি এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে জামাতের সদস্যরাও তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সারা বিশ্বে দিনরাত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এখানে সংক্ষেপে এই বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে হুযূর (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) তাঁর খুতবা ও ভাষণে আসলে কী শিক্ষা উপস্থাপন করছেন। কয়েকটি বক্তব্য নিম্নরূপ:

আহমদিয়া জামাতের মূলমন্ত্র

আহমদিয়া খেলাফতের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে জামাত সর্বত্র ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পঞ্চম খলিফাও তাঁর অসংখ্য ভাষণে শান্তির ইসলাম-এর বার্তা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

"ইসলাম এমন একটি সুন্দর ধর্ম যা তার বিরোধীদের প্রতিও সদাচরণের শিক্ষা দেয়। আমরা শুধু সেই ধর্মকেই জানি, যা ভালোবাসা ও স্নেহের ধর্ম ইসলাম ন্যায়বিচার প্রয়োগে শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তদুপরি, ইসলাম শত্রুর প্রতিও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সব ধর্মের প্রেরিত ব্যক্তি ও নবীদের সম্মান বজায় রাখে। প্রকৃতপক্ষে, তারাই সামাজিক ও সামষ্টিক শান্তি নষ্ট করে যারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে নবীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং তাদের বিভিন্ন অপমানজনক নামে ডাকে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর পরিচয় করানো এবং মানবতার সেবা করা। আমাদের লক্ষ্য এই নয় যে আমাদের মুখে প্রশংসা করা হবে। আমাদের মূলমন্ত্র হলো:

'সবার জন্য ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়।'

আমাদের সবার উচিত সর্বদা আল্লাহভীতি মনে রাখা।"

(বদর পত্রিকা, সংখ্যা ৪৪, ২০০৮)

ন্যায় ও ন্যায্যতা ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার অভাবে কোনো সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে পঞ্চম খলিফা বলেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে বিশ্বের শান্তি ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল, এবং তোমাদের ন্যায়বিচারের মান কত উচ্চ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও এবং কোনো জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনো ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার কর-এটাই তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্পর্কে সর্বদা অবগত।"

(খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৬৫)

শক্তিশালী দেশগুলোকে ন্যায়বিচার করার উপদেশ

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁকে তাঁর শক্তিশালী সাহায্যে সমর্থন করুন) তাঁর ভাষণসমূহে বহুবার শক্তিশালী দেশগুলোকে ন্যায়বিচার করার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ এর মাধ্যমেই শান্তি ও সমঝোতার পথ উন্মুক্ত থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর শক্তিশালী সাহায্যে সমর্থন করুন) বলেন:

"বড় বড় দেশগুলো অন্য দেশগুলোকে অন্যায়ভাবে 'শান্তি'র নামে নিজেদের অধীনস্থ করে রাখে, তাদেরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং নিজেদের শর্তে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দেয়-শুধু এই জন্য যে তারা ছোট দেশগুলোর সম্পদ থেকে লাভবান হতে পারে এবং তাদের সম্পদের ওপর দখল নিতে পারে। আজ পৃথিবীতে যে সমস্ত অশান্তি দেখা যায়, তার মূল কারণ এটিই। বিশ্ব অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য অথবা অর্থ উপার্জনের জন্যই এই সব অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায়, অন্যের সম্পদের প্রতি লোভের কারণেই এসব হচ্ছে। অন্যের সম্পদকে নিজের সম্পদে পরিণত করার লালসাই এই অশান্তির কারণ। আর এই যুগে এগুলো বেড়ে গেছে, কারণ যে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন, তা এখন সাধারণ হয়ে গেছে।"

(খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬৭)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে শক্তিশালী দেশগুলো প্রায়ই দুর্বল দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এটি একটি তিক্ত সত্য যে সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে মানবতাকে ভুলে যাওয়া হয়। শক্তিশালী দেশগুলো তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অপব্যবহার করে দুর্বল দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে অন্য দেশগুলোর সম্পদের ওপর দখল নেওয়া এবং সেখান থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করা। এর ফলে বিশ্বে অস্থিতিশীলতা ও অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, কারণ আল্লাহ যে অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে নিষেধ করেছিলেন, তা এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু যখন এসব কর্মকর্তাদের বলা হয় যে এমন নীতি প্রণয়ন করবেন না যেখানে ছোট দেশগুলোকে উপেক্ষা করা হয় বা তাদের প্রাপ্য সুবিধা দেওয়া হয় না, তখন তারা বলে যে তারা নাকি এসব কাজ শুধু তাদের কল্যাণের জন্য করছে, যাতে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। একই ধরনের বক্তব্য ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টও দিয়েছেন যে তারা নাকি ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কিন্তু এই 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' নামে তারা হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

আরেকটি উদ্‌ধৃতিতে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর শক্তিশালী সাহায্যে সমর্থন করুন) বলেন:

"কোনো পক্ষেরই উচিত নয় যে তারা অন্যদের সম্পদ ও সম্পদসমূহকে হিংসাত্মক দৃষ্টিতে দেখবে। একইভাবে কোনো দেশের উচিত নয় অন্যায়ভাবে অন্য দেশের সম্পদের ওপর তাদের সাহায্যের ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে দখল নেওয়া। একইভাবে প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদানের অজুহাতে সরকারগুলোর উচিত নয় অন্য জাতির সঙ্গে অন্যায্য বাণিজ্যিক চুক্তি করে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করা। এভাবে সাহায্য বা দক্ষতা প্রদানের নামে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পদ বা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত নয়। তবে যেখানে কম শিক্ষিত ব্যক্তি বা সরকারকে শেখানোর প্রয়োজন হয় যে তারা কীভাবে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, সেখানে তা করা উচিত।"

('আলমী সংকট এবং শান্তির পথ', পৃষ্ঠা ৭৭)

এছাড়াও হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর শক্তিশালী সাহায্যে সমর্থন করুন) বলেন:

"শক্তিশালী দেশগুলোকে তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর অধিকার দখল করা উচিত নয়। একইভাবে দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করা উচিত নয়। অন্যদিকে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোরও উচিত নয় শক্তিশালী ও ধনী দেশগুলোর ক্ষতি করার সুযোগ খোঁজা; বরং উভয় পক্ষেরই উচিত ন্যায়বিচারের নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

('আলমী সংকট এবং শান্তির পথ', পৃষ্ঠা ৭৬)

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসের উল্লেখ এবং একটি সতর্কবার্তা

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁকে তাঁর শক্তিশালী সাহায্যে সমর্থন করুন) বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে এবং বড় শক্তিগুলোকে ন্যায়বিচার করার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

"বর্তমান যুগে আল্লাহর রুদ্রমূর্তির প্রকাশ একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের রূপে প্রকাশ পেতে পারে–এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন একটি যুদ্ধের কুফল ও ধ্বংস শুধু একটি প্রচলিত যুদ্ধ বা শুধু বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এর ভয়াবহ প্রভাব বহু প্রজন্ম ধরে প্রকাশ পেতে থাকবে। এমন যুদ্ধের মর্মান্তিক ফলাফল সেই নবজাত শিশুদের ভোগ করতে হবে, যারা এখন বা ভবিষ্যতে জন্ম নেবে। আজ যে অস্ত্রগুলো বিদ্যমান, সেগুলো এতটাই ধ্বংসাত্মক যে এর ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জেনেটিক বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জাপানই একমাত্র দেশ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক হামলার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। আজও যদি আপনি জাপানে যান এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে তাদের চোখে এবং কথায় যুদ্ধের প্রতি গভীর ভয় ও ঘৃণা দেখতে পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্র, যা ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছিল, আজকের ছোট দেশগুলোর কাছে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রের তুলনায় অনেক কম শক্তিশালী ছিল।

বলা হয়, জাপানে সাত দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও নবজাত শিশুদের মধ্যে পারমাণবিক বোমার কুফল এখনো দেখা যায়। যদি কাউকে গুলি করা হয়, তবে চিকিৎসা পেলে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু যদি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে যারা সরাসরি এর আওতায় আসবে, তাদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। মানুষ মুহূর্তের মধ্যে মারা যাবে, অথবা মূর্তির মতো জমে যাবে এবং তাদের চামড়া পানির মতো গলে পড়বে। পানীয় জল, খাদ্য ও শাকসবজি পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়বে। এই ধ্বংসের ফলে যে সব রোগ সৃষ্টি হবে, আমরা কেবল তার কল্পনাই করতে পারি। এমনকি যেখানে সরাসরি হামলা হবে না এবং যেখানে ধ্বংসের প্রভাব কম থাকবে, সেখানেও রোগের আশঙ্কা অনেক বেড়ে যাবে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও বড় বিপদের সম্মুখীন হবে।"

সতর্ক অনুমান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছয় কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে, এবং বলা হয় এর মধ্যে চার কোটি মানুষ ছিল সাধারণ নাগরিক। অন্য কথায়, সৈনিকদের তুলনায় বেশি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিল। জাপান ছাড়া অন্য সব স্থানে প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এত ভয়াবহ ধ্বংস সাধিত হয়েছিল। ব্রিটেনে পাঁচ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। সে সময় ব্রিটিশ সরকার ছিল একটি ঔপনিবেশিক শক্তি, এবং তার উপনিবেশগুলো ও যেসব দেশ তার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, সেসব স্থানের মৃত্যুর সংখ্যাও যদি যোগ করা হয়, তাহলে এই সংখ্যা কয়েক কোটিতে পৌঁছে যায়। শুধু ভারতেই ষোল লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

তবে এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। যেসব দেশ একসময় ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল এবং তার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, তারা এখন যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে প্রস্তুত হতে পারে। তাছাড়া, যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছি, এখন কিছু ছোট দেশও পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করেছে।

উদ্বেগের বিষয় হলো, এই পারমাণবিক অস্ত্রগুলো যেন এমন লোকদের হাতে না পড়ে, যাদের যথেষ্ট যোগ্যতা নেই বা যারা তাদের কাজের পরিণতি বুঝতে চায় না। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের মানুষ পরিণামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং যুদ্ধোন্মাদনায় আক্রান্ত।

অতএব, যদি বড় শক্তিগুলো ন্যায়বিচার না করে, ছোট দেশগুলোর বঞ্চনার অনুভূতি দূর না করে এবং জ্ঞানপূর্ণ কৌশল গ্রহণ না করে, তাহলে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ঘটবে তা আমাদের কল্পনারও অতীত হবে, এবং বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ, যারা শান্তি কামনা করে, তারাও এই ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে।"

(গ্লোবাল ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য পাথ টু পিস, পৃষ্ঠা ৪৩–৪৫)

ইসলামের শিক্ষা ও এর বার্তা ভালোবাসা, সহানুভূতি, নম্রতা ও শান্তি ছাড়া আর কিছু নয়

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর সহায় হোন) এক শান্তি সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে বলেন:

"এই শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে আমি সমগ্র বিশ্বকে এই বার্তা দিতে চাই যে ইসলামের শিক্ষা ও এর বার্তা ভালোবাসা, সহানুভূতি, নম্রতা এবং শান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

দুঃখজনক বিষয় হলো, মুসলমানদের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ ইসলামের একটি সম্পূর্ণ বিকৃত চিত্র উপস্থাপন করে এবং তাদের বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, তাদের উপস্থাপিত ইসলামকে প্রকৃত ইসলাম হিসেবে বিবেচনা করবেন না এবং তাদের ভুল কাজকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের বৃহৎ অংশের অনুভূতিতে আঘাত করবেন না বা তাদের প্রতি অবিচার করবেন না।

পবিত্র কুরআন সকল মুসলমানের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও সর্বাধিক সম্মানিত গ্রন্থ। তাই এর অবমাননা করা, এর বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা বা একে পুড়িয়ে ফেলা অবশ্যই এমন কাজ, যা মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করে। আমরা দেখেছি, এ ধরনের কাজের প্রতিক্রিয়ায় চরমপন্থী মুসলমানরা প্রায়ই সম্পূর্ণ ভুল ও অনুপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সম্প্রতি আমরা আফগানিস্তানে দুটি ঘটনার কথা শুনেছি, যেখানে কিছু আমেরিকান সৈন্য পবিত্র কুরআনের অবমাননা করেছে এবং নিরীহ নারী ও শিশুদের তাদের ঘরে হত্যা করেছে। একইভাবে, দক্ষিণ ফ্রান্সে এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়াই এক ফরাসি সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে এবং কয়েক দিন পর একটি স্কুলে প্রবেশ করে সেখানে তিনজন নিরীহ ইহুদি শিশু ও তাদের একজন শিক্ষককে হত্যা করে।

এ ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ ভুল এবং এর মাধ্যমে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ ধরনের অন্যায় প্রতিনিয়ত পাকিস্তানসহ অন্যান্য স্থানে ঘটছে, এবং এসব কর্মকাণ্ড ইসলামের বিরোধীদের জন্য ইসলামবিরোধী ঘৃণা প্রকাশ এবং বৃহৎ পরিসরে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের অজুহাত তৈরি করে। এ ধরনের নৃশংসতার প্রকাশ, তা ছোট পরিসরেই হোক বা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে না হোক, প্রকৃতপক্ষে কিছু সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত অন্যায্য নীতির ফল।

অতএব, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যে প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি দেশে ন্যায়বিচারের সঠিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হোক। পবিত্র কুরআন একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য ঘোষণা করেছে।

অতএব, আবারও একজন মুসলমান হিসেবে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে ইসলাম কোনোভাবেই জুলুম ও অন্যায়কে অনুমোদন করে না।"

মতভেদ দূর করতে হবে

বর্তমান বিপজ্জনক বৈশ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর সহায় হোন) বিশ্ববাসী মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসরায়েল সরকার, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বড় শক্তিগুলোর হাত থামাতে সক্ষম। সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতেই রয়েছে। তবে এর জন্য মুসলমানদেরও তাদের কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এবং ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদের পারস্পরিক মতভেদ দূর করতে হবে, যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না। তখনই আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।"

(খুতবা জুমা, ১২ অক্টোবর ২০২৪)

অন্যত্র, মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন:

"মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ

এবং রাজতন্ত্রগুলোর উচিত শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা না করে বরং একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসেবে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করা, এবং এ জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। তখনই আমরা বিশ্বের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব। তখনই আমরা আমাদের মর্যাদা বজায় রাখতে পারব এবং তখনই ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোকে আমাদের ভিতর থেকে বিভক্ত করতে বাধা দিতে পারব। এর জন্য আমাদের এই বিষয়টিও চিন্তা করা উচিত যে এই যুগে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কী ব্যবস্থা করেছেন। সেই ঐশী ব্যবস্থা কী, যা আমরা অনুসরণ বা গ্রহণ করলে এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারি এবং একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হতে পারি? সেই ঐশী ব্যবস্থা হলো, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি উম্মাহকে একত্রিত করতে পারেন।"

(আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, শুক্রবার, ২ মার্চ ২০২৬, পৃষ্ঠা ৩)

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কাজ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা**

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর সহায় হোন) জামাতের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন:

"তোমাদের একমাত্র কাজ হলো বিশ্বে শান্তির প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। তাদের ঘৃণা ও অত্যাচারের জবাবে তোমরা শুধু বলো-তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এবং তাদের জানাও যে তোমরা তাদের জন্য শুধু শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছো। আহমদিয়া মুসলিম জামাত এই শিক্ষার ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এর অনুযায়ী জীবনযাপন করছে। এটাই সেই সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও সহানুভূতির শিক্ষা, যা আমরা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে কাজ করছি।

আমরাই সেই আহমদী মুসলমান, যারা পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই ঐতিহাসিক, অতুলনীয় ও অনন্য দয়া, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অনুসরণ করি-যিনি বহু বছর ধরে কঠিন কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার পর যখন বিজয়ী রূপে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি; বরং ঘোষণা করেছিলেন যে তোমাদের কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, কারণ আমি তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি ভালোবাসা, শান্তি ও নিরাপত্তার নবী। আমাকে আল্লাহর 'আস-সালাম' (শান্তির উৎস) গুণের সর্বাধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে। তিনিই সেই সত্তা, যিনি শান্তি প্রদান করেন। আমি তোমাদের সব পূর্বের অত্যাচার ক্ষমা করে দিচ্ছি এবং তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।"

(গ্লোবাল ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য পাথ টু পিস, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮)

আহমদিয়া জামাতের জন্য উপদেশ

হুযূর (আল্লাহ তাঁকে তাঁর সহায় হোন) আহমদিয়া জামাতকে উপদেশ দিয়ে বলেন:

"আজ আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের হক আদায় করতে পারি। আমরা যেন তাঁর নির্দেশ অনুসরণকারী হই এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার পূরণকারী হই। যদি এমন হয়, তখনই আমরা এই পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার আবাসস্থলে পরিণত করতে পারব। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। (আমীন)

(খুতবা জুমা, ১৮ অক্টোবর ২০২৪)

বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আন্তরিক দোয়ার আহ্বান

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে তাঁর সহায় হোন) বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আহমদিয়া জামাতকে আন্তরিক দোয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন:

"আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের আগুন ও এর পরবর্তী প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। এখন মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে আছে; বরং একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বের শাসকদের এতে কোনো উদ্বেগ নেই। তারা মনে করে তারা নিরাপদ থাকবে আর সাধারণ মানুষ মারা যাবে। কিন্তু এটিও তাদের ভ্রান্ত ধারণা-তারা নিজেদের অহংকারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের কোনো চিন্তা নেই। এগুলো প্রতারণামূলক কৌশল। তারা জনগণকে তাদের ফাঁদে ফেলেছে, বলে যে তারা যা করছে সবই জনগণের কল্যাণের জন্য।

যাই হোক, এখন কিছু স্থানে জনগণের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু তাদের কৌশল মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তারা নিজেরা যেমন দূরে আছে, তেমনি অশ্লীলতা ও বেপরোয়াও চরমে পৌঁছেছে। এটিও আল্লাহর অপছন্দনীয়। এর ফলাফল হবে এই যে তারা আল্লাহর পাকড়াওয়ের মধ্যে পড়বে।

এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া এবং দোয়ার মধ্যে গভীর অনুনয় সৃষ্টি করা। আল্লাহ আমাদেরকে আন্তরিকভাবে দোয়া করার তাওফিক দান করুন।"

(আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, শুক্রবার, ২ মার্চ ২০২৬, পৃষ্ঠা ৭)

ঈদুল ফিতরের খুতবা

"মূল কথা হলো, দুনিয়া নিজে উদ্দেশ্য না হয়ে বরং দুনিয়া অর্জনের মূল উদ্দেশ্য যেন দ্বীন হয়।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ২০ মার্চ, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২০ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)**

আজ আমি ঈদের খুতবাও দিয়েছি, তাই এ সময় আমি সংক্ষিপ্ত খুতবা দেব। এ জন্য আমি হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি, যার প্রতি আমাদের সর্বদা মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন:

"একজন মুমিনের দুনিয়ার সাথে যত বিস্তৃত সম্পর্কই থাকুক না কেন, তা তার উচ্চ মর্যাদার কারণ হয়ে থাকে, কেননা তার মূল লক্ষ্য হয় দ্বীন।"

অর্থাৎ, দুনিয়ার বিস্তৃত সম্পর্কও তখনই উত্তম হয় যখন তার উদ্দেশ্য হয় দ্বীন। অর্থাৎ দুনিয়ার যেসব সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্যও দ্বীন হওয়া উচিত। এটাই একজন মুমিনের নিদর্শন।

"আর দুনিয়া, তার ধন-সম্পদ ও মর্যাদা দ্বীনের খাদেম হয়ে থাকে। সুতরাং মূল কথা হলো, দুনিয়া নিজে উদ্দেশ্য না হয়ে বরং দুনিয়া অর্জনের মূল উদ্দেশ্য যেন দ্বীন হয়।"

দুনিয়া উপার্জন করলেও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যেন আমাদের দ্বীন আরও উন্নত হয়। আমাদের দ্বীনের সেবা করতে হবে।

যদি দুনিয়া উপার্জনও করি, তবে তা যেন দ্বীনের কল্যাণের জন্য হয়; এমন নয় যে ভুল পথে উপার্জন করে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই নষ্ট করে ফেলব। বরং আমাদের আখিরাতকে সুন্দর করার জন্য এবং দ্বীনকে সুদৃঢ় করার জন্য দুনিয়া উপার্জন করা উচিত।

তিনি আরও বলেন:"এবং এমনভাবে দুনিয়া অর্জন করা উচিত যেন তা দ্বীনের খাদেম হয়। যেমন একজন মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য সফরে সওয়ারি ও রসদের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য থাকে গন্তব্যে পৌঁছানো, সওয়ারি বা সফরের উপকরণ নিজে নয়।"

আমরা সফরে আরাম ও সুবিধার জন্য যেসব জিনিস সঙ্গে রাখি, তার উদ্দেশ্য হয় যেন যাত্রা সহজে সম্পন্ন হয় এবং আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি-এ নয় যে শুধু সেগুলোতেই মগ্ন হয়ে পড়ব।

তিনি বলেন: "ঠিক তেমনিভাবে মানুষ দুনিয়া অর্জন করবে, কিন্তু তাকে দ্বীনের খাদেম মনে করে।"

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দোয়া শিখিয়েছেন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(সূরা আল-বাকারাহ: ২০২)

অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।" হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আল্লাহ তাআলা যে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন- رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -এখানেও তিনি দুনিয়াকে আগে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন দুনিয়াকে?

প্রথমে দুনিয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কেন? কোন ধরনের দুনিয়া?

"সেই 'হাসানাতুদ দুনিয়া'-কে, যা আখিরাতের কল্যাণের কারণ হয়ে যায়।"

অর্থাৎ এমন দুনিয়া, যা অর্জন করলে আখিরাতেও উপকার হবে। এমন দুনিয়ার নিয়ামত লাভ করতে হবে, যা আখিরাতের কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে-এমন নয় যে দুনিয়ার কারণে আখিরাতে লজ্জিত হতে হবে। কারণ মানুষ যখন পুরোপুরি দুনিয়ায় ডুবে যায়, তখন আখিরাতে লজ্জার সম্মুখীন হতেই হয়। তিনি আরও বলেন:

"এই দোয়ার শিক্ষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, একজন মুমিনকে দুনিয়া অর্জনের সময় আখিরাতের কল্যাণের কথা স্মরণ রাখতে হবে। আর 'হাসানাতুদ দুনিয়া' শব্দের মধ্যে দুনিয়া অর্জনের সেই সকল উৎকৃষ্ট উপায়ের উল্লেখও এসে গেছে, যা একজন মুমিন মুসলমানের অবলম্বন করা উচিত। দুনিয়া এমন সব উপায়ে অর্জন করো, যার মধ্যে কল্যাণ ও উত্তমতা রয়েছে। এমন উপায় নয়, যা অন্য মানুষের কষ্টের কারণ হয় কিংবা যা মানুষের মধ্যে লজ্জা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন দুনিয়াই অবশ্যই 'হাসানাতুল আখিরাহ-এর কারণ হবে।"

(শেষাংশ পরের পাতায়....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 7-14 May, 2026 Issue No.19-20

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ এর পাতার পর..)

এই হাদীসের মর্যাদা গভীরভাবে চিন্তা করো, যা আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত। অথচ যে হাদীসটি আপত্তিকারী উপস্থাপন করেছে, তা আলেমদের সমালোচনার অধীন এবং এর সহীহ হওয়া নিয়ে মতভেদ আছে। আপত্তিকারী কি চিন্তা করেনি যে শেষ যুগের খলিফাদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে হারিসের আগমন, মাহদীর আগমন এবং আল্লাহ-প্রেরিত খলিফার আগমনও অন্তর্ভুক্ত?

হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে যুগ তিনটি:

প্রথমত, খিলাফতে রাশেদার যুগ; এরপর বিচ্যুতি ও ফিতনার যুগ, যেখানে রাজতান্ত্রিক শাসন চলবে; এবং এরপর শেষ যুগ, যা নবুওয়তের পদ্ধতির উপর হবে, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে আমার উম্মতের প্রথম ও শেষ অংশ পরস্পরের মতো, যেমন বৃষ্টি-যেখানে বোঝা যায় না তার শুরুতে বরকত বেশি নাকি শেষে।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী খলিফাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাতে তারা নবুওয়তের আলো আয়নার মতো গ্রহণ করে মানুষকে কুরআনের সৌন্দর্য ও পবিত্র বরকত প্রদর্শন করে। এটাও মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি যুগে "ইতমামুল হুজ্জাহ" ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঘটে, এবং যুগের মুজাদ্দিদ এমন ক্ষমতা ও যোগ্যতা নিয়ে আসেন যা বর্তমান ফিতনার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন। অতএব আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা চালিয়ে যান যতক্ষণ তিনি চান যে হিদায়াত ও সংশোধনের নিদর্শন পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকুক। এসব বিষয় কেবল অনুমান নয়; বরং ধারাবাহিক উদাহরণ এগুলোর সাক্ষ্য বহন করে।

বনী ইসরাইলের নবী, রাসূল ও মুলহামদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে মূসা (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ)-এর মধ্যবর্তী প্রায় চৌদ্দশ বছরে তাদের মধ্যে হাজার হাজার নবী ও মুলহাম প্রেরিত হয়েছেন, যারা তাওরাতের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কুরআন ও বাইবেল উভয়ই এর সাক্ষ্য দেয়। তারা নতুন কোনো গ্রন্থ বা নতুন ধর্ম আনেননি; বরং তারা তাওরাতের সেবক ছিলেন, যখনই বনী ইসরাইলে বিকৃতি, অবিশ্বাস, দুর্নীতি ও কঠোরতা দেখা দিত তখন তারা আবির্ভূত হতেন।

এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করুক: যখন আল্লাহ তা'আলা মূসার মতো সীমিত শরীয়তের জন্য হাজার হাজার নবী প্রেরণ করেছেন, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল না এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃতও ছিল না, তখন কীভাবে ধারণা করা যায় যে এই উম্মত, যা "উত্তম জাতি" এবং "সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল-এর সাথে যুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ কেবল ত্রিশ বছরের প্রকাশ্য বরকতের পর চিরতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, বড় বড় ফিতনা এসেছে, বিভিন্ন বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে-তবুও (তাদের মতে) আল্লাহ তা'আলা আর কখনো এই উম্মতের দিকে দৃষ্টি দেননি।

এমন ধারণা কি সেই দয়ালু আল্লাহর প্রতি আরোপ করা যায়, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনা দূর করার জন্য প্রেরণ করেছেন? আমরা কি বলতে পারি যে আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিগুলোর প্রতি বারবার নবী ও মুজাদ্দিদ পাঠিয়ে দয়া করেছেন, কিন্তু এই উম্মতকে সম্পূর্ণরূপে তার বুদ্ধি ও যুক্তির উপর ছেড়ে দিয়েছেন?

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৪২)

সাইয়্যিদুনা মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস্ সালাম) বলেন-

"এর উপরও চিন্তা করা উচিত যে, যে অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমি এই উম্মতের মধ্যেও ঠিক সেইভাবে খলীফা সৃষ্টি করতে থাকব যেভাবে মূসার পরে খলীফা সৃষ্টি করেছি, তখন দেখা উচিত ছিল যে, হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ওফাতের পরে আল্লাহ্ তাআলা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কি কেবল ত্রিশ বছর পর্যন্ত খলীফা প্রেরণ করেছিলেন, নাকি চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত এ ধারাকে দীর্ঘ করেছিলেন?

অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর হযরত মূসা (আ.) অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল-যেমন তিনি নিজেই বলেছেন:

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

অর্থাৎ, "আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তোমার প্রতি অত্যন্ত মহান।"

এবং এই উম্মত সম্পর্কে বলেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে বের করা হয়েছে।"

তাহলে কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফাদের ধারা চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত চলবে, আর এখানে মাত্র ত্রিশ বছর পরেই খেলাফতের সমাপ্তি হয়ে যাবে?

আর যখন এই উম্মতকে খেলাফতের আধ্যাত্মিক জ্যোতি থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখা হয়েছে, তখন ***"ওয়া আখারীনা মিনহুম"*** আয়াতের-এর অর্থ কী-কেউ কি তা ব্যাখ্যা করবে?

একটি প্রবাদ আছে:

"যে নিজেই পথ হারিয়েছে, সে অন্যকে কীভাবে পথ দেখাবে?

যখন এই উম্মতকে চিরদিনের জন্য অন্ধ করে রাখাই উদ্দেশ্য, এবং এই ধর্মকে মৃত করে রাখাই লক্ষ্য, তখন আবার এ কথা বলা যে-"তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মানুষের কল্যাণ ও পথনির্দেশের জন্য সৃষ্টি হয়েছ-এর অর্থ কী?

অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?

হে মুসলমানগণ, আল্লাহর দোহাই! ভেবে দেখো! এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ এটাই যে, কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন ও অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান থাকবে, এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা তোমাদের নিকট থেকে আলো গ্রহণ করবে।

আর এই আধ্যাত্মিক জীবন ও অন্তর্দৃষ্টি-যা অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করার যোগ্যতা নিজের মধ্যে ধারণ করে-এটিকেই অন্য ভাষায় 'খেলাফত' বলা হয়।

তাহলে তোমরা কীভাবে বলো যে, খেলাফত মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল, অতঃপর তা অস্তিত্বহীনতার কোণে লুকিয়ে গেল?

"اِتَّقُوااللّٰهَ-اِتَّقُوااللّٰهَ-اِتَّقُوااللّٰهَ"

(আল্লাহকে ভয় করো)

(শাহাদতুল কুরআন, পৃষ্ঠা ৩৫২

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে খিলাফতে আহমদিয়া-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার এবং নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯১-৯২, সংস্করণ ১৯৮৪)

এমন দুনিয়া উপার্জন করো, যা শুধু তোমার নিজের উপকারেই না আসে, বরং মানবজাতিরও উপকারে আসে। আর দুনিয়াতে এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যা তোমার জন্য লজ্জার কারণ হয়, তোমার পরিবার ও আপনজনদের জন্য অপমানের কারণ হয়। বরং জীবন হোক পবিত্র ও নির্মল, নেকি ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যখন এমন জীবন হবে এবং তোমরা এমন দুনিয়া অর্জনের জন্য জীবন ব্যয় করবে, তখন সেই দুনিয়া তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় স্থানেই সফলতা দান করবে।

সুতরাং আজ যখন পৃথিবী সাধারণভাবে নিজের উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির পিছনে পড়ে আছে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে-যদি জাতিগুলোর দিকে তাকাই, তবে তারা কেবল নিজেদের জাতির কথাই চিন্তা করছে, মানবতার কথা নয়-আর এভাবেই তারা নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ প্রস্তুত করছে।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনার প্রতি মনোযোগী হওয়া। আমাদের এ বিষয়ে অত্যন্ত বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যেন আমরা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সুন্দর করতে পারি এবং সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।

যেমন আমি বলেছি, পৃথিবী ধ্বংসের গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ করুন, আমরা যেন নিজেদের আমলও উন্নত করার তৌফীক পাই এবং এ ধরনের দোয়া করারও তৌফীক লাভ করি, যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে খুতবায় বলেছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এসব কল্যাণ অর্জনের তৌফীক দান করুন, উত্তম দোয়া করার তৌফীক দান করুন এবং সেগুলো কবুলও করুন। (মুদ্রিত: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ এপ্রিল ২০২৬, পৃষ্ঠা ২)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir